বিজ্ঞানে কি ও কেন

দ্বিতীয় পর্যায় : পুস্তিকা ২

সম্পাদনা : আর জি লাগু • মুখবন্ধ : হোমি এন সেঠনা

হোমি ভাভা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইন্‌স্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ, বম্বে

বিজ্ঞানে কি ও কেন

দ্বিতীয় পর্যায় : পুস্তিকা ২

সম্পাদনা

আর. জি. লাগু
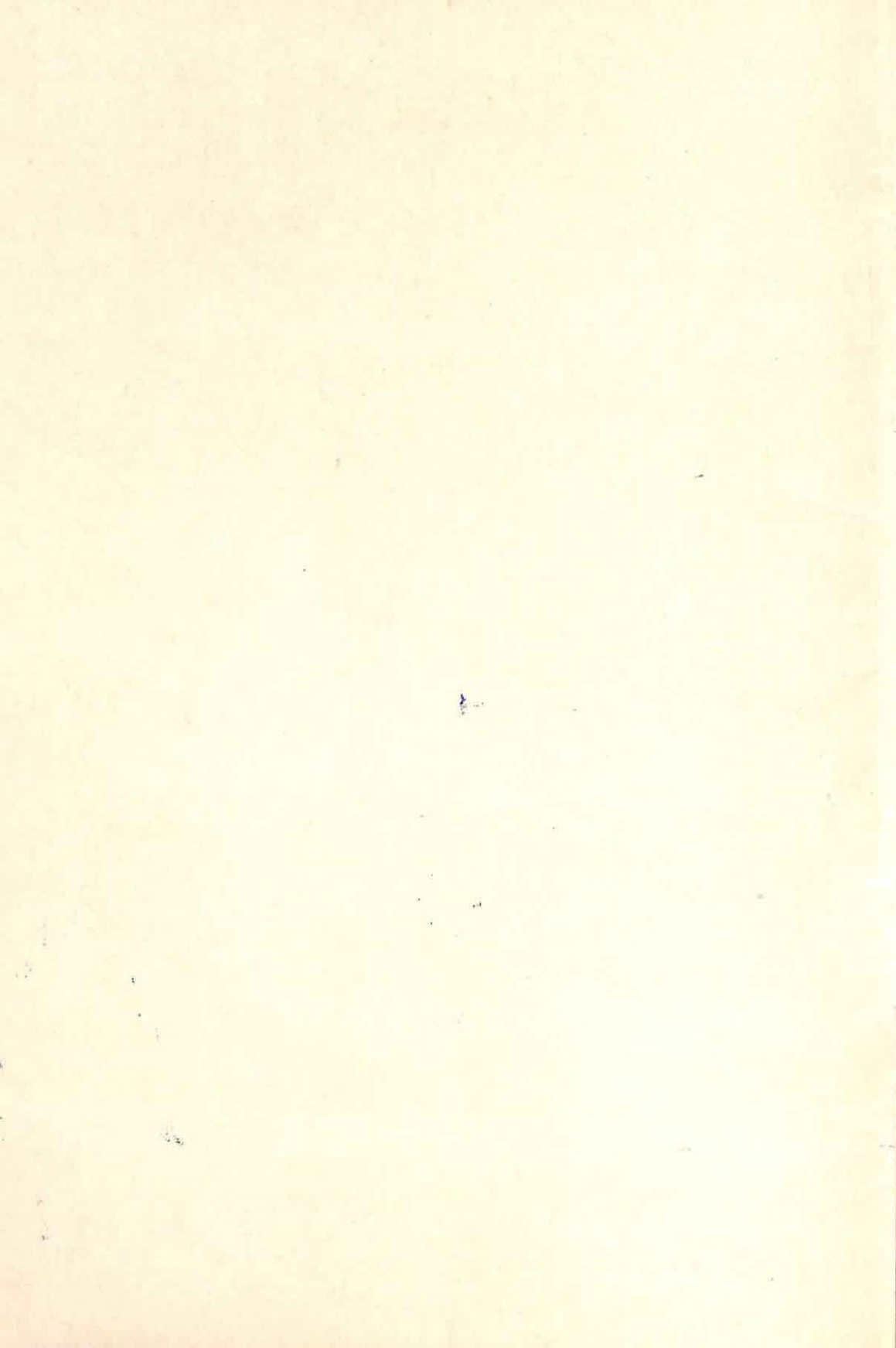
চিত্রাঙ্কণ

এ. ডি. ঘাইসাস
এম. জে. চবন
ডি. বি. পাটিল

হোমি ভাভা সেণ্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ

কলকাতা
অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস
দিল্লী বম্বে মাদ্রাজ
১৯৮৯

Oxford University Press, Walton Street, Oxford OX2 6DP

NEW YORK TORONTO
DELHI BOMBAY CALCUTTA MADRAS KARACHI
PETALING JAYA SINGAPORE HONG KONG TOKYO
NAIROBI DAR ES SALAAM
MELBOURNE AUCKLAND

and associates in
BERLIN IBADAN

How and Why in Science Senior Series Book 2 has been written and illustrated by

HOMI BHABHA CENTRE FOR SCIENCE EDUCATION
TATA INSTITUTE OF FUNDAMENTAL RESEARCH
Homi Bhabha Marg, Bombay 400 005

AUTHORS

V. G. Kulkarni
R. G. Lagu
R. V. Sovani
R. M. Bhagwat
N. D. Wadadekar
S. P. Ozarkar
S. C. Agarkar
Jayashree Ramdas
V. G. Gambhir
D. T. Tarey
Vidya N. Wadadekar
Sunita V. Utgi
Shakuntala Raman

Translated by ANUVA MUKHOPADHYAY

Printed in India at
Prabartak Prtnting & Halftone Ltd. 52/3 B. B. Ganguly Street, Calcutta 700 012
and published by S. K. Mookerjee, Oxford University Press
Faraday House, P-17 Mission Row Extn, Calcutta 13

মুখবন্ধ

চারপাশের জগতে যা ঘটছে তার পেছনে কারণগুলো তরুণ ছাত্রদের বুঝতে সাহায্য করাই এই বইয়ের উদ্দেশ্য। সহজ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কতগুলি সাধারণ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আর তারই মধ্য দিয়ে বিষয় সম্পর্কে ছাত্রদের উৎসাহ ও ঔৎসুক্য ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। ছাত্রদের মনে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার শিক্ষা জাগিয়ে তুলে এই বই আরও অনেক ঘটনার কারণ বুঝতে সাহায্য করবে। বিজ্ঞান এক চিন্তাধারা যা আমাদের চারপাশের প্রকৃতিকে বুঝতে এবং উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আকাশ যে নীল তা শুধু চোখে দেখার চেয়ে জানা আরও বেশি আকর্ষণীয়। প্রতিটি প্রাকৃতিক ঘটনার পেছনেই একটা না একটা কারণ আছে, আর এই কারণ ও তার ফলাফল বুঝতে বিজ্ঞান আমাদের সহায়তা করে। ফলে আমরা প্রকৃতির দয়ায় না থেকে নিজেরাই নিজেদের পরিবেশের প্রভু হয়ে উঠি।

এই বইয়ে আলোচিত প্রশ্নগুলি দেশের নানা প্রান্তের শিশুদের মনের প্রশ্ন। উত্তর এবং বিষয়গুলির আলোচনা এমনভাবে হয়েছে যাতে তারা ভাবনা চিন্তা করতে ও আরও গভীর ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে উদ্বুদ্ধ হয়। কোন কোন জায়গায় সহজে করা যায় এমন পরীক্ষার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

একটি পরিকল্পিত পর্যায়ের এটি হল দ্বিতীয় পুস্তিকা। এই বইটি আমাদের সব তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের খুবই কাজে লাগবে, কেন না আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান যে কত মজার মজার হাতিয়ার জোগাচ্ছে তা এখনও তাদের জানতে বাকি।

বম্বে
ডিসেম্বর ১৯৮০

হোমি. এন. সেঠনা
চেয়ারম্যান, অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন

সূচীপত্র

১। বহুরূপী (একধরণের গিরগিটি) কেমন করে রঙ বদলায়?

গিরগিটি মোটেই এমন প্রাণী নয় যা দেখতে পাওয়া যায় না। বনে জঙ্গলে বা নির্জন বাগানে তোমরা হয়তো একে দেখেও থাকবে। গিরগিটি নানারকমের হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার গায়ের রঙ বদল করতে পারে। সাধারণতঃ মরুভূমির গিরগিটি রঙ বদলাতে পারে না। তবে যারা বনেজঙ্গলে থাকে তারা অনায়াসেই রঙ বদলায়। বহুরূপী এমনই একধরণের গিরগিটি যা গায়ের রঙ বদল করার ক্ষমতার জন্যেই বিখ্যাত।

চিত্র ১। বহুরূপী তার চোখ ঘোরাতে পারে স্বতন্ত্রভাবে।

প্রত্যেক প্রাণীর ত্বক কোষ দিয়ে তৈরি। এই কোষগুলিতে একরকম রঙিনবস্তু বা তন্তুরঞ্জক (pigment) থাকে। এরাই ত্বকে রঙ এনে দেয়। বহুরূপীর স্বচ্ছত্বকের নিচে তিনটি স্তরে এই রঙিন কোষগুলি থাকে। একেবারে বাইরের স্তরটিতে লাল এবং হলুদ রঙের কোষ থাকে। এর নিচের স্তরটিতে একরকমের স্ফটিকের মত দানা থাকায় এটি সাদা এবং নীল রঙ প্রতিফলিত করতে পারে। সকলের ভেতরের স্তর যে কোষগুলি দিয়ে তৈরি তার মধ্যে 'মেলানিন' নামে কালো রঞ্জক থাকে। এই কোষগুলি (melanophores) থেকে ওপরের দুই স্তরে সরু ছোটো নলের মত আঁকসি উঠে গেছে। স্নায়বিক উত্তেজনা ঘটলে তার মধ্যে দিয়ে মেলানিন-কণিকা ওপরে উঠে যেতে পারে। এই কোষগুলিই রঙের বৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে।

বহুরূপী যখন সম্পূর্ণ গা এলিয়ে থাকে, মেলানিন-কণা একেবারে নিচের স্তরে জমা থাকে। মাঝের স্তর থেকে সাদা আলো প্রতিফলিত হয়, তাই বহুরূপীটি হলদে বা লাল্‌চে দেখায়। মেলানোফোর উত্তেজিত হলে, কণাগুলি মধ্যস্তরে চলে আসে। সাদা আলো আর প্রতিফলিত হয় না। বহুরূপীকে দেখায় নীল হলদে মেশানো (অর্থাৎ সবুজ) বা লাল নীল মেশানো রঙএর। আরও উত্তেজিত হলে কালো কণাগুলি সরু নলের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে ওপরের স্তরে উঠে আসে এবং বহুরূপীকে খয়েরি দেখায়। এই অবস্থায় অন্য দুটি স্তর সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

ভয়, রাগ, এইসব অনুভূতিগুলির সঙ্গে সঙ্গে বহুরূপী রঙ বদলায়। চারপাশের তাপমাত্রার ওপরেও রঙ নির্ভর করে। কখনও শত্রুকে ফাঁকি দিতেও বহুরূপী তার রঙ বদলানোর ক্ষমতা ব্যবহার করে। চারপাশের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে বহুরূপী তার গায়ের রঙ এমন করে বদলায় যাতে শিকারীর পক্ষে তাকে খুঁজে বার করা কঠিন হয়ে পড়ে।

অনুমান করতে পারো কি সৈন্যবাহিনীর পোষাকের রঙ কেন জলপাই সবুজ ?

২। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অমেরুদণ্ডী কোনটি ?

পৃথিবীতে প্রাণীদের নানাভাবে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে একটি হলো প্রাণীগুলির মেরুদণ্ড আছে, কি নেই সেই অনুসারে তাদের ভাগ করা। যাদের মেরুদণ্ড আছে সেইরকম প্রাণীদের মেরুদণ্ডী এবং যাদের নেই তাদের অমেরুদণ্ডী বলা হয়। অমেরুদণ্ডীর শুধু মেরুদণ্ড থাকে না তা নয়, দেহে আর কোনো হাড়ও থাকে না। মানুষ, গরু, বানর, সাপ, মাছ, পাখি প্রভৃতি মেরুদণ্ডী এবং আরশুলা, প্রজাপতি, পিঁপড়ে, কেঁচো, জেলিফিস্, কাঁকড়া, অ্যামিবা প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী।

স্কুইড নামে শামুকজাতীয় একরকম মাছই সবচেয়ে বড় অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মনে রেখো নানা জাতের স্কুইড আছে। একটি বিশেষ ধরণের স্কুইড শুঁড় ছড়ানো অবস্থায় ৫০ ফুটের ওপর লম্বা হয়। আশ্চর্য্যের কথা যে এত বড় একটি প্রাণীর দেহে একটিও হাড় নেই। ঠিক যেন একটি মস্ত বড় থলের মতো।
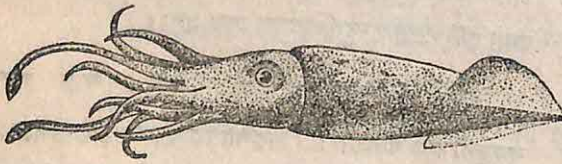
চিত্র ২। স্কুইডের দুটো লম্বা শুঁড় আর আটটা দাঁড়া আছে। এরা সাঁতার কাটে তীব্রগতিতে, বা কখনও ধীরে, নিজের ডানা ব্যবহার করে।

এই দৈত্যস্কুইডের বাস সমুদ্রে। বিচিত্র এক উপায়ে এটি জলের মধ্যে চলাফেরা করে। নিজের মধ্যে জল ভরতি করে নিয়ে (এটি প্রচুর পরিমাণ জল ধরে রাখতে পারে) তোড়ে সেই জল বার করে দেয়। জলের তোড়ের চাপে এটি এগিয়ে চলে। এরা বেঁচে থাকে সমুদ্রের অন্য প্রাণী খেয়ে।

এরকমই এক অদ্ভুত কায়দায় স্কুইড্ আত্মরক্ষা করে। এর শরীরে কালো কালির মত তরল বস্তু ভরা একটি থলে থাকে। বিপদ বুঝলেই এটি সেই কালো তরল বস্তুটি শরীর থেকে নির্গত করে দেয়। চারপাশের জল কালো হয়ে যায় এবং তাই কমবেশি অস্বচ্ছ হয়ে যায়। সেই কালো পর্দার আড়াল দিয়ে শত্রুর হাত থেকে এটি পালায়।

তোমরা কি জানো যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পালিয়ে যাওয়ার জন্যে যুদ্ধ জাহাজগুলি একরকম ঘন ধোঁয়ার আবরণ তৈরি করতো ?

৩। বৃদ্ধলোকেদের চুল সাদা কেন ?

চুল বাস্তবিকই ত্বকের একটি অংশ। আমাদের ত্বকের বর্ণ শরীরের পাঁচরকম পিগ্‌মেন্ট-এর ওপর নির্ভর করে। মেলানিন তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

মেলানিন একরকম ঘন খয়েরি রঞ্জক যা আমাদের শরীরে মেলানোসাইট্ (Melanocyte) নামক কোষ দ্বারা উৎপন্ন হয়। আমাদের ত্বকের নিচে, চুলে এবং চোখে মেলানিন জমা আছে। আমাদের বহিত্ব'ক পাতলা বলে তার নিচে জমা মেলানিন্ এর রঙ যে কেউ দেখতে পেতে পারে। ঠিক যেমন গাছের পাতায় ক্লোরোফিল আছে বলে তাঁকে সবুজ দেখায়।

ত্বকের নিচের মেলানিন্-এর পরিমাণ একটি লোকের গায়ের রঙ নির্ধারণ করে। মেলানিন কম থাকলে রঙ ফরসা ও বেশি থাকলে রঙ কালো

হয়। চুল ত্বকেরই অংশ বলে চুলের রঙও ত্বকের নিচের মেলানিন-এর পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। তেমনি চোখের রঙও মেলানিন এর ওপর নির্ভরশীল। সাধারণভাবে যে লোকেরা গরম আবহাওয়ায় বাস করে ওদের কালো গাত্রবর্ণ, কালো চুল এবং কালো চোখ হয়। তবে এও দেখবে উষ্ণ আবহাওয়ায় (যেমন ভারতে) বসবাসকারী সব লোকের একই রকম রঙ হয় না। ত্বক্, চুল এবং চোখের রঙের পার্থক্যে খানিকটা বৈচিত্র্য থাকে। কিছু লোক বেশ ফরসা আবার অনেকে বেশ কালো। তেমনি চুলের রঙে কালো থেকে হালকা খয়েরি এবং চোখের রঙে কালো থেকে বেড়ালের মত ধূসর পর্যন্ত বর্ণবৈচিত্র্য ঘটে।

অন্যদিকে যারা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় বাস করে সাধারণতঃ তাদের রঙ ফরসা হয়, চুলের রঙও হালকা হয়। এখানেও রঙের বৈচিত্র্য সোনালি থেকে পিঙ্গল পর্যন্ত হয়। তাদের চোখ সাধারণতঃ হালকা রঙের, লক্ষ্য করে দেখবে সাধারণভাবে গায়ের রঙ, চুলের এবং চোখের রঙ একই ধরণের হয়।

ত্বকের নিচের রঞ্জক যদি সমবন্টিত না হয় তবে ত্বকের ওপর দাগ দেখা দেয়। কখনও খুব স্বল্প জায়গায় অনেক বেশি পরিমাণ মেলানোসাইট্ জমে গেলে সেই অংশ অন্য অংশের তুলনায় কালো দেখায়। এইরকম ছোটো দাগকে আমরা তিল বা জরুল বলি।

বৃদ্ধবয়সে শরীরের মধ্যকার সবরকম ক্রিয়া ধীরগতি হয়ে আসে। কোষগুলি কম মেলানিন উৎপন্ন করে। সেই কারণে চুল প্রথমে ধূসর তারপর সাদা হয়ে যায়। প্রত্যেকটি চুল একেকটি ছোটো স্বচ্ছ নলের মত। যতক্ষণ তার মধ্যে মেলানিন ভরা থাকে, তাকে কালো দেখায়। যখন নলে আর যথেষ্ট পরিমাণ মেলানিন থাকে না, রঙ পালটাতে থাকে। শূন্য নলটি সাদা দেখায়। তোমরা নিশ্চয়ই বল পেনের রিফিল্ টিউব দেখেছো। নীলকালি ভরা থাকলে রিফিলটি নীলরঙের দেখায়। তবে শূন্য রিফিল্ টিউব ধূসর দেখায়।

অনেক সময় অল্পবয়সেও কোষগুলির মেলানিন উৎপাদন ক্ষমতা শেষ হয়ে যায়। এরকম লোকের অল্পবয়সেও চুল সাদা হয়ে যায়। মেলানিন্ তৈরি করার জন্যে মেলানোসাইট-এর বিশেষ একরকম পদার্থ দরকার করে যা হলো উৎসেচক। যদি এই উৎসেচক না থাকে, যথেষ্ট মেলানিন তৈরি হয় না এবং ত্বকের কোনো কোনো অংশ (চুল ছাড়াও) সাদা হয়ে যায়। এরকম লোক শ্বেতী রোগে ভোগে। শ্বেতী কোনো সংক্রামক রোগ নয়, কেবল মেলানিন-এর অভাব থেকে এর উৎপত্তি। এটি ত্বকের একটি অবস্থামাত্র।

৪। অস্থিতে আর রক্তে ক্যানসার কাকে বলে?

তোমরা জানো সব প্রাণীর শরীরই কোষ দিয়ে তৈরি। মানুষ সহ প্রত্যেক প্রাণীর ক্ষেত্রেই পুরোনো কোষ বিভাজন দ্বারা অনবরত নতুন কোষ তৈরি হচ্ছে। একটি স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে এই কোষবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ভাবে এবং নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায় ঘটে। কখনও কখনও কোনোও আপাত কারণ ছাড়াই অনিয়ন্ত্রিত ভাবে কোষবৃদ্ধি হতে থাকে। তার ফলে একটি বড় সড় কোষের দলা তৈরি হয় এবং তাকে বলা হয় ক্যানসার জাতীয় টিউমার।

এই দুর্ঘটনাটি আমাদের শরীরের যে কোনো জায়গায় ঘটতে পারে। আমরা যাদের ফুসফুসের

ক্যানসার, পাকযন্ত্রে ক্যানসার, গলায় ক্যানসার, স্তনে ক্যানসার বলি সেগুলি আসলে দুর্ঘটনার স্থান নির্দেশ করে এবং শরীরের যে অংশটি কষ্ট পাচ্ছে সেই অংশটিকে বোঝায়।

তোমরা জানো অস্থির মধ্যেও নতুন কোষ তৈরি হয়। একটি সুস্থ অস্থির অভ্যন্তরে নতুন কোষ তৈরি হয় ও বহির্ভাগের পুরোনো কোষ ক্রমাগত মরে যেতে থাকে। অস্থির ক্যানসারে এই অভ্যন্তরের কোষগুলি অনির্দিষ্টভাবে বেড়ে গিয়ে অস্থির মধ্যেই টিউমার তৈরি করে। টিউমার হওয়ার জন্য ফাঁপা হাড়ের দরকার করে না। ফাঁপা বা জমাট, বড় বা ছোটো যে কোনোরকম অস্থিতে টিউমার তৈরি হতে পারে।

ভেতর থেকে চাপ সৃষ্টি করে টিউমার অস্থিকে বিকৃত করে দিতে পারে। এই বিকৃতি চারপাশের পেশী এবং রক্তনালীর ওপর চাপ ফেলে রক্তপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। অস্থি ক্যানসার যত বৃদ্ধি পায়, ভেতরের চাপও বাড়তে থাকে এবং অস্থিটি ভঙ্গুর হয়ে যায়। এই বৃদ্ধি তীব্র যন্ত্রণাদায়ক হয়। এই অবস্থায় বাইরে থেকে সামান্য চাপ পড়লেও অস্থিতে চিড় ধরতে পারে বা এমনকি ভেঙেও যেতে পারে।

ক্যানসার জাতীয় টিউমার হয় কেটে বাদ দিতে হয় নয়তো কোবাল্ট ৬০ এর মতো কোনো তেজস্ক্রিয় উৎস থেকে গামা রশ্মি দিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস করে দিতে হয়। অস্থি ক্যানসারের ক্ষেত্রে আক্রান্ত অস্থিটির বদলে অনুরূপ একটি স্টেনলেস্ স্টীলের অস্থি লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই অঙ্গবৃদ্ধিকে অনেক সময় জোরালো লেজার আলো দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

একজনের রক্তেও ক্যানসার হতে পারে। অন্য সবরকম ক্যানসারে একটি টিউমার সৃষ্টি হয়। কিন্তু রক্তে ক্যানসারে কোনোও টিউমার থাকে না। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত বেশ অন্যরকম দেখায়। রক্তে অস্বাভাবিক বেশি পরিমাণ শ্বেতকণিকা পাওয়া যায়। অনেক সময় রোগী রক্তাল্পতায় ভোগে। রক্তে হেমোগ্লোবিন কম থাকার ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা কমে যায়। রক্ত ক্যানসারে ভুগছে এমন ব্যক্তিটি দুর্বল বোধ করে, সর্বদা ঘুম পায় এবং বমি ভাব অনুভব করে।

দুর্ভাগ্যক্রমে এখনও রক্তে ক্যানসার নিরাময়ের কোনো উপায় বার হয়নি; এর একমাত্র চিকিৎসা হলো রক্ত প্রবিষ্টকরণ অর্থাৎ রোগীর দেহের রক্ত সরিয়ে নতুন সুস্থ রক্ত শরীরে প্রবেশ করানো। আসল ত্রুটিটি শ্বেতকণিকা তৈরির মধ্যেই থাকে তাই এই নিরাময় নিতান্তই সাময়িক হয়। এই শ্বেতকণিকাগুলি নতুন রক্তেও সংযোজিত হতে থাকে ফলে প্রতি দুই থেকে চারমাসে নতুন রক্ত দিতে হয়। এখনও অবশ্য জানা নেই কেন আমাদের দেহের কোষগুলি এই আপাত অদ্ভুত ব্যবহার করে।

৫। হৃদ্‌রোগ কি? এটি কি রোধ করা যায়?

আমরা প্রায়ই শুনি অনেকে আকস্মিক হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। অনেকক্ষেত্রেই মৃত্যু এত সহসা যে কোনো চিকিৎসা করার সুযোগ পাওয়া যায় না।

আমাদের শরীরে হৃৎযন্ত্র একটি অত্যাবশ্যক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি পেশী দ্বারা গঠিত একটি সঞ্চালক যা সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে শরীরের ছোটো বড় রক্তবাহীনালীর জালের মধ্যে দিয়ে রক্ত সঞ্চালন করে। আমাদের শরীর খাদ্য থেকে যে গ্লুকোজ এবং অন্যান্য পুষ্টিকর বস্তু গ্রহণ করে রক্ত তা বয়ে নিয়ে যায়। গ্লুকোজ পুড়িয়ে

শক্তি উৎপাদনের জন্যে যে অক্সিজেন প্রয়োজন রক্ত তাও বহন করে। স্বাভাবিকভাবেই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময়েই হৃৎযন্ত্র ব্যস্ত থাকে।
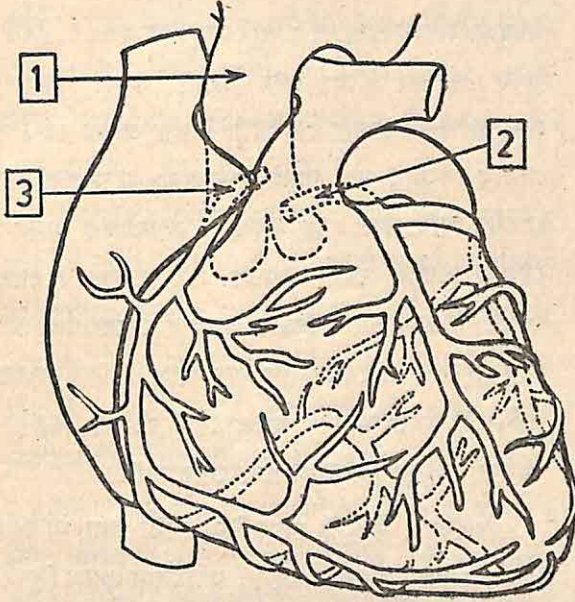
চিত্র ৩। মানব হৃৎযন্ত্র। এটি সংকুচিত হলে রক্ত ধমনী (1) দিয়ে শরীরে প্রবাহিত হয়। ঠিক তারপরই, যখন হৃৎযন্ত্র প্রসারিত হয়, ধমনীর কিছু রক্ত দুটি প্রধান শিরায় হৃৎযন্ত্রের দিকে ধায় (2 আর 3)। এর মধ্য দিয়েই হৃৎযন্ত্রের পেশীতে রক্ত জোগান হয়।

আমাদের শরীরের যে কোনো অঙ্গের মতো হৃৎযন্ত্রেরও রক্তের দরকার। হৃৎযন্ত্রকে নিজের পেশীতেও রক্ত জোগান দিতে হয়। যোগান ভালমত হলে হৃৎযন্ত্র ঠিকমত কাজ করে। এমন কিছু ধমনী আছে যা হৃৎপিণ্ডের পেশীতে রক্ত জোগান দেয়। হৃৎপিণ্ড যেন কোনো এক ব্যাঙ্কের খাজাঞ্চির মত, যে প্রচুর টাকা নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিন্তু নিজে নির্দিষ্ট বেতন মাত্র পায়।

হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়া মানে রক্ত যোগানের অপ্রতুলতা হেতু হৃৎযন্ত্রের পেশীর কোনো অংশ অকেজো হয়ে পড়া। যে দুটি প্রধান ধমনী হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন করে তারা হৃৎযন্ত্রের পেশীর মধ্যে বহু ছোটো ছোটো ধমনীতে ভাগ হয়ে জালক তৈরি করে। কখনও কোনো একটি ধমনীর অভ্যন্তরভাগ পুরু এবং অমসৃণ হয়ে গিয়ে ধমনীকে সঙ্কীর্ণ করে দেয়। তোমরা জানো আমাদের খাদ্যের অন্যতম অংশ হলো চর্বি। খুব বেশি চর্বিযুক্ত খাদ্য ক্রমাগত খেতে থাকলে অব্যবহৃত বাড়তি চর্বিটি রক্তে এসে জমা হয়। রক্তে অতিরিক্ত চর্বি জমে রক্তনালীর মধ্যে একটি আবরণের সৃষ্টি করে। ফলে নালীটি অপ্রশস্ত এবং পুরু হয়ে যায়। হৃৎযন্ত্রে রক্ত সঞ্চালনকারী কোনো ধমনীতে এরকম ঘটলে, যতক্ষণ অপ্রধান ধমনীগুলি হৃৎযন্ত্রের পেশীতে যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত জোগান দেবে ততক্ষণই মাত্র কোনো লোক সুস্থ ও স্বাভাবিক বোধ করবে। হৃৎযন্ত্রের পেশীর কোনো নির্দিষ্ট অংশে রক্তসংবাহী নালীগুলি যদি অপ্রশস্ত অনমনীয় এবং পুরু হয়ে যায় তবে পেশীতে অক্সিজেন কম পড়বে। কিন্তু তখনও বেঁচে থাকার মত যথেষ্ট অক্সিজেন পাওয়া যাবে। রক্ত জোগানের এই অপ্রতুলতাকে বলে 'অ্যানজাইনা পেক্‌টরিস্'। পরিশ্রম করলেই এরকম লোকের বুকে কষ্ট হয়। সামান্য বিশ্রাম নিলে আবার কষ্ট কমে যায়। অ্যানজাইনা আসলে ক্ষয়িষ্ণু হৃদয়ের আর্তনাদ। এই অবস্থা থেকে করোনারি ধমনীর মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে যেতে পারে (করোনারি থ্রম্বোসিস্)। রক্তনালীর অমসৃণ দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে অসুবিধে করে যাওয়ার সময় রক্তের একটি দানা সহজেই জমাট বেঁধে যেতে পারে। এই জমা বাঁধা দানাটি যদি হৃৎযন্ত্রের পেশীর কোনো

একটি অংশে রক্তসঞ্চালনের পথে সম্পূর্ণ বাধা সৃষ্টি করে তবে সেই অংশ একেবারেই অক্সিজেন পাবে না। ফলে মরে যাবে। কোনো উপায়েই একে আর বাঁচিয়ে তোলা যায় না। এই অবস্থায় কোনো ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটতে পারে, অথবা প্রচণ্ড যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে পারে কিংবা সে এমনকি সম্পূর্ণ স্বাভাবিকও বোধ করতে পারে (নিঃশব্দ হৃদ্‌রোগ)। এটা নির্ভর করে করোনারি জালের মধ্যে ঠিক কোন জায়গায় রক্তটা দানা বেঁধেছে তার ওপর।

বুকে প্রচণ্ড বেদনা, বামহাতে যন্ত্রণা অথবা অসাড় বোধ, সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ঘাম হওয়া এগুলি হৃদ্‌-রোগের লক্ষণ। এক্ষেত্রে রোগীকে শুইয়ে রেখে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।

বেশিরভাগ হৃদ্‌রোগই এড়ানো যায়। কতকগুলি নিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রিত অভ্যেস—ধূমপান না করা, বেশি চর্বিযুক্ত খাবার না খেয়ে সাদাসিধে খাদ্যগ্রহণ, নিয়মিত ব্যায়াম—হৃদ্‌রোগের বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

শিশু এবং তরুণদের অযথা হৃদ্‌রোগের আতঙ্কে ভোগার দরকার নেই। স্বাভাবিক সক্রিয় জীবনযাপন করলে এ রোগ সম্ভবত কখনই হবে না। যদি কখনও বুকে ব্যথা হয় ভয় পেও না। হজমের গোলমালের কারণে বা পাকস্থলীতে গ্যাসের চাপে পেট ও বুকের মধ্যের মধ্যচ্ছদার চাপের দরুণ এই ব্যথা হতে পারে।

৬। উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে আধা অন্ধকার ঘরে ঢুকলে কিছুক্ষণ আমরা কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাই না। কেন?

উজ্জ্বল ও মৃদু উভয় আলোতেই আমরা দেখতে পাই। আলোর ঔজ্জ্বল্য অনুসারে আমাদের চোখের মণি তার আকার কম বেশি করে নেয়। কম আলোয় চোখের মণি বড় হয়ে ছড়িয়ে যায় যাতে অনেক বেশি আলো চোখে প্রবেশ করতে পারে। উজ্জ্বল আলোয় চোখের মণি সঙ্কুচিত হয়। একটা সহজ পরীক্ষা দিয়ে এটা যাচাই করতে পারো। তোমার বন্ধুর চোখে জোরালো টর্চের আলো ফেললে দেখবে তোমার বন্ধু পছন্দ করুক বা না করুক তার চোখের মণি ছোট হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বাড়িতে বেড়াল থাকলে তার ওপরেও এই পরীক্ষা চালাতে পারো। একইভাবে উজ্জ্বল আলোর থেকে অন্ধকার ঘরে ঢুকলে চোখের মণি বড় হয়ে ছড়িয়ে যেতে খানিকটা সময় লাগে। যখন সেটি যথেষ্ট বড় হয় আমরা সবকিছু স্পষ্ট দেখতে আরম্ভ করি।

অন্ধকারে তক্ষুনি কেন কিছু দেখা যায় না তার আরও একটি কারণ আছে। আমাদের চোখে তিনটি স্তর আছে। সবচেয়ে ভেতরের স্তরটির নাম রেটিনা। যে কোষগুলি দ্বারা রেটিনা তৈরি তাদের বলে রড্ (rod) এবং কোন্ (cone)। রড্ এর মধ্যে বেগুনী রঙের 'রোডপ্‌সিন্' নামে একপ্রকার পদার্থ থাকে। কোনো বস্তু থেকে আলো এসে রেটিনার ওপর পড়লে 'রোডপ্‌সিন্' ভেঙ্গে দুটি পদার্থ হয়ে যায়। এই
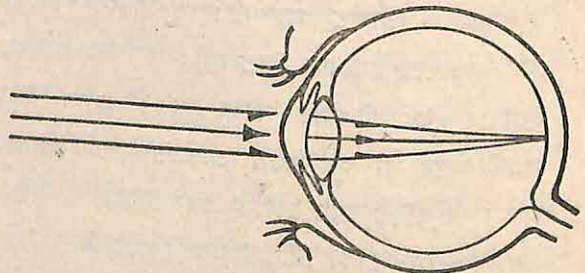
চিত্র ৪ (ক)। মানব চক্ষুর আড়াআড়ি কর্তিত নমুনা

প্রক্রিয়া মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত প্রেরণ করে এবং তখন আমরা বস্তুটি দেখতে পাই।

তবে এখানে একটা অসুবিধে আছে। যদি চোখে আলো প্রবেশের দ্বারা 'রোডপ্‌সিন্‌' ক্রমাগত ভেঙ্গে যেতে থাকে, তবে এমন একটা সময় আসবে যখন এর সবটাই ভেঙ্গে ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যাবে। ফলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব। এই বিপর্যয় কি ভাবে রোধ করা যায়?

রোডপ্‌সিন্‌ যেমন ক্রমাগত ক্ষয়ে যায় তেমনি ক্রমাগত তৈরিও হয়। ফলে রেটিনাকে কখনই সম্পূর্ণ রোডপ্‌সিনের অভাবে ভুগতে হয় না। উজ্জ্বল আলোয় আমাদের চোখ ক্লান্ত হতে পারে কিন্তু আমরা কখনই অন্ধ হয়ে যাব না। রোডপ্‌সিনের ভাঙ্গন এবং পুনর্গঠন আমাদের রেটিনাতে ক্রমাগত ঘটতে থাকে।

উজ্জ্বল আলোয় অনেকটা রোডপ্‌সিন্‌ ভেঙ্গে যায়। হঠাৎ অন্ধকার ঘরে ঢুকলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই না কেননা রোডপ্‌সিনের পরিমাণ কমে যায়। রোডপ্‌সিন আবার তৈরি হতে খানিকটা সময় লাগে। তারপর সব কিছু আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।

উল্টোটাও আমরা বিবেচনা করতে পারি। অন্ধকার ঘর থেকে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোয় এসে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অন্ধকারে অল্প রোডপ্‌সিন্‌ ক্ষয় হয় এবং বাকিটা পুরোপুরি থাকে। হঠাৎ উজ্জ্বল আলো চোখে প্রবেশ করলে অনেকটা রোডপ্‌সিন্‌ ক্ষয়ে যায়। সব প্রক্রিয়াটিই অত্যন্ত দ্রুত ঘটে। ফলে মস্তিষ্কে এত দ্রুত সঙ্কেত যায় যে সেটি সে ধরতে পারে না এবং আমাদের চোখ নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

রোডপ্‌সিন্‌ তৈরির জন্যে ভিটামিন এ প্রয়োজন। ভিটামিন এ-র অপ্রতুলতাই রাতকানা হওয়ার কারণ। রাতকানা লোক কম আলোয় ঘরে দেখতে খুব
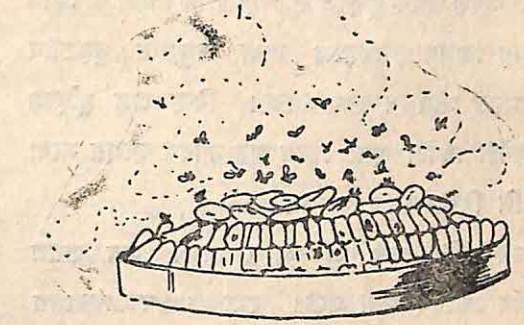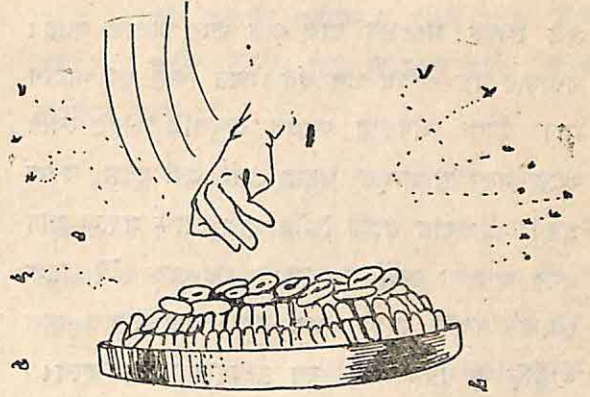
চিত্র ৪ (খ)। মিষ্টির পাত্রের ওপর উড়ছে মাছি। যে কোন শব্দ তাদের উড়িয়ে দিচ্ছে। শব্দ থেমে গেলে আবার আসছে ফিরে। (রোডপ্‌সিনের ভাঙ্গন ও পুনর্গঠন)

অসুবিধে বোধ করে। অবশ্য প্রচুর মাত্রায় ভিটামিন এ দিয়ে এই অসুবিধে সহজেই দূর করা যায়। ভিটামিন এ-তে ভরা গাজর এবং শাকসব্‌জি প্রচুর পরিমাণে খেলে তোমরা নিশান্ধতায় ভুগবে না।

৭। এলোমেলোভাবে জল ছুঁড়লে তা গোল গোল ফোঁটায় পড়ে কেন? বরফের ক্ষেত্রে এরকমটি হয় না কেন?

জল একটি তরল পদার্থ। তোমরা জানো তরল পদার্থকে খুব সহজেই ছোটো ছোটো অংশে ভাগ করে দেওয়া যায়। (এখানে তরল পদার্থের ভাগ মানে কিন্তু অণু নয়। তরল পদার্থের একটি ক্ষুদ্র অংশে লক্ষ লক্ষ অণু থাকে)। আমরা এক গ্লাস

জল থেকে সহজেই অল্প অল্প করে ঢালতে পারি। বরফের মত কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে কিন্তু তা পারবে না। ঠাণ্ডা অবস্থায় জলের অণুগুলি আরও বেশি করে পরস্পর সম্পৃক্ত থাকে এবং জল জমে বরফ হয়। একবার বরফ তৈরি হলে তাকে সহজে ভাগ করে আলাদা করা যায় না। মস্ত এক চাঁই বরফ থেকে একটি ছোটো খণ্ড বরফ বার করতে হলে হাতুড়ি বা বরফ কাটা যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে।

একখণ্ড বরফ ছুঁড়লে তা ঝুরো ঝুরো হয়ে ভেঙ্গে যায় না কেননা বরফের মধ্যে অণুগুলি দৃঢ়ভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে। কিন্তু জল ছুঁড়লে তা ফোঁটা ফোঁটা হয়ে ভেঙ্গে যায় কারণ জলের মধ্যে অণুগুলি শিথিলভাবে থাকে।

একফোঁটা জল সুগোল দেখায়। সব তরল পদার্থের ক্ষেত্রেই এটা ঘটে। মেঝের ওপর পারদের বিন্দু পড়লে সেটি গোল হয়ে পড়ে। একটি থালায় একবিন্দু মধু ফেললেও সেটি গোল দেখায়। প্রত্যেকটি তরল পদার্থের ফোঁটাই গোল দেখায় কেন?

একবিন্দু তরল পদার্থে লক্ষ লক্ষ অণু থাকে। তারা পরস্পরকে কাছে টেনে রাখার চেষ্টা করে। একটি বিন্দুর ওপরে অণুগুলি পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং ফোঁটার মধ্যের অণুগুলি দ্বারা আকৃষ্ট হয়। এই আণবিক আকর্ষণের ফল হলো বিন্দুটির উপরিভাগ যথাসম্ভব ছোটো করে আনা। একই পরিমাণ মাটির তাল দিয়ে যদি ভিন্ন ভিন্ন জিনিস তৈরি কর— যেমন একটি চৌকো, একটি নলাকৃতি বস্তু, একটি গোলক অথবা কোনও অসম আকৃতি বস্তু—দেখবে গোলকে সবচেয়ে ছোটো উপরিভাগ তৈরি হয়েছে। তার মানে সমপরিমাণ বস্তু দিয়ে যদি বিভিন্ন আকার গড়া যায় তবে গোলকেই উপরিভাগের আয়তন সবচাইতে কম হবে। জলবিন্দুর ক্ষেত্রে এই একই সূত্র প্রযোজ্য। নির্দিষ্ট প্রদত্ত পরিমাণের জন্যে সবচেয়ে কম আয়তনের নিয়ম অনুসারে জলবিন্দু বর্তুলাকার হয়।

অন্য কতকগুলি কারণ বর্তমান থাকলে বর্তুলাকার গড়ন নষ্ট হয়ে যায়। যেমন জলের কল থেকে পড়তে থাকা জলবিন্দু আকারে বড় হয়ে যেতে থাকে এবং এর বর্তুলাকার গড়ন পরিবর্তিত হয়ে যায়। নিজের ভারেই এটি নিচে পড়ে। তেমনি কাঁচের প্লেটে একটি ছোটো জলবিন্দু গোলই দেখায়, কিন্তু বড় হয়ে গেলে তাকে চ্যাপ্টা দেখায়।

৮। কল থেকে জল পড়ে কোনো পাত্র ভরতি হতে থাকলে ধ্বনি ক্রমাগত বদলায় কেন?

তোমরা জানো কম্পনশীল বস্তু থেকে ধ্বনি তৈরি হয়। বাদ্যযন্ত্রের তার, ঢাকের পর্দা, বাঁশির ফুটো, হারমোনিয়ামের রিড এইরকম শব্দ উৎপাদনকারী কম্পনশীল বস্তুর কয়েকটি নমুনা। বস্তুতঃ আমরা যখন কথা বলি আমাদের গলার স্বরতন্ত্রীগুলোয় কম্পন হয় এবং ধ্বনি সৃষ্টি হয়।

জলের খোলা কলের নিচে একটি পাত্র বসিয়ে রাখলে পাত্রে জল পড়ার শব্দ প্রতিনিয়ত বদলে যেতে থাকে। গোড়ায় থাকে খাদে (নিচু পর্দায়), পাত্রে জল যত ভরে ওঠে তত তীক্ষ্ণ (উঁচু পর্দায়) হয়ে ওঠে। এই স্বরধ্বনি কি করে তৈরি হয়?

ধাতুতে কম্পন ওঠে এবং ধ্বনি সৃষ্টি হয়। জল যত ভরে ওঠে ধাতব শব্দ কমজোরী হয়ে যায়। ধাতব শব্দ ছাড়াও আর একরকম শব্দ পাত্র থেকে আসে। জলের ওপরে তোড়ে জল পড়তে থাকায়

পাত্রের মধ্যেকার হাওয়ায় কম্পন জাগে। জলের উপরিভাগ থেকে পাত্রের কানা পর্যন্ত খাড়াখাড়ি উঠে যাওয়া বায়ু স্তম্ভে কম্পন হয় এবং সেটি শব্দ সৃষ্টি করে। আমরা এই শব্দের পরিবর্তন শুনি।

গোড়ায় যে শব্দ খাদে থাকে পাত্র জলপূর্ণ হতে থাকলে তা তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। নিচু খাদের ধ্বনির স্পন্দন কম থাকে। এই ধ্বনি স্পন্দন যত বাড়ে, ধ্বনি তত তীক্ষ্ণ হতে থাকে। কম্পমান বায়ুস্তর থেকে উত্থিত শব্দের স্পন্দনের কমবেশি নির্ভর করে বায়ুস্তম্ভের উচ্চতার (বা দৈর্ঘ্যর) ওপর। বায়ুস্তম্ভ যত দীর্ঘ হয় ততই স্পন্দন কম হয়। পাত্রে জল যত ভরতি হয় বায়ুস্তম্ভ ক্রমশঃ ছোটো হয়ে আসে এবং ধ্বনির স্পন্দনদ্রুততা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তাই এই দ্রুতস্পন্দন শব্দ বা উঁচু পর্দা শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

ওপরে বলা হয়েছে পাত্রের ধাতব গাত্রও শব্দ উৎপন্ন করে। পাত্র যত জলে পূর্ণ হয় এই কম্পন চাপা পড়ে যেতে থাকে। শব্দ চাপা পড়ে যাওয়া বোঝার জন্যে একটা সহজ পরীক্ষা করতে পারো। শূন্য ধাতব গামলায় চামচ ঠুক্‌লে একটা বিশেষ শব্দ হয়। গামলাটা হাতে ধরে যদি পরীক্ষাটা আবার কর ভিন্নরকম শব্দ হবে। এই শব্দে স্পন্দনদ্রুততা কম হবে এবং শব্দ তাড়াতাড়ি মিলিয়ে যাবে। সম্পূর্ণ ফাঁকা একটি বালতি কলের জলের নিচে বসালে দুরকম শব্দই (ধাতব এবং বায়ুস্তরের) শোনা যাবে। জল ভরে উঠতে থাকলে ধাতব শব্দ চাপা পড়ে যাবে। তোমরা যে পরিবর্তিত শব্দ শোনো তা অনেকটাই বায়ুস্তর ছোটো হয়ে আসার কারণে।

তোমরা কি এখন বুঝলে কি ভাবে একজন শিল্পী জলতরঙ্গে নানা সুর তুলতে পারেন বা বাঁশিতে কি করে নানারকম সুর বাজান?

৯। একটি ছোটো লৌহখণ্ড ডুবে যায় তবে লোহার পাতে তৈরি বড় জাহাজ জলে ভাসে কেমন করে?

একটি লোহার টুক্‌রো বা একটি সূঁচ জলে পড়লে ডুবে যায়। লোহা দিয়ে তৈরি বড় বড় জাহাজগুলি স্বচ্ছন্দে ভেসে বেড়ায়। এগুলি ভেসে থাকে কিভাবে? কতকগুলি বস্তু জলে ডুবে যায় আর অন্য অনেক বস্তু ভাসে। কেমন করে একজন বুঝবে কোন্ বস্তুটি ডুববে আর কোন্‌টি ভাসবে?

জলের মধ্যে কোনো বস্তু ছুঁড়ে দিলে জল ঠেলা দিয়ে বস্তুটিকে ওপরে তুলে দেয়। একে বলে ভাসমানতা। একটি শূন্য মুখবন্ধ টিন জলের মধ্যে ঠেলে ঢোকাবার চেষ্টা কর। তোমাদের হাতে জলের ঊর্ধ্বচাপ অনুভব করবে। নদীর জলে একটি বালতি ডুবোলে যতক্ষণ সেটি জলের নিচে থাকে ততক্ষণ হালকা মনে হয় এবং যেই টেনে ওপরে তুলতে যাই হঠাৎ ভারি হয়ে ওঠে। তেমনি একটি চৌকো কাঠের টুক্‌রো হাত দিয়ে চেপে জলের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে হাত সরিয়ে নিলেই সেটি ঝাঁকি দিয়ে ওপরে উঠে আসে এবং ভাসতে থাকে। দাঁড়িপাল্লায় বাঁধা একটি বস্তুর ওজন তরল পদার্থে ডোবানো অবস্থায় কমে যায়। এই অভিজ্ঞতাগুলি থেকে আমরা দেখতে পাই জলে ফেলা সমস্ত বস্তুকেই জল ওপরের দিকে ঠেলে তুলে দেয়।

পৃথিবী প্রতিটি বস্তুকেই নিজের দিকে টানছে। এই টানকে বস্তুটির ওজন বলে। জলের মধ্যে একটি বস্তুকে পৃথিবী নিচের দিকে টানে এবং জল ওপর দিকে ঠেলে দেয়। যদি এই টানাটানির খেলায় পৃথিবী জেতে তবে বস্তুটি ডুবে যায়; যদি জল জেতে তবে বস্তুটি ভাসে।

প্রত্যেক বস্তুর ঘনত্ব আছে। জলেরও ঘনত্ব আছে। কোনো বস্তু ডুববে না ভাসবে তা বস্তুটির এবং জলের ঘনত্ব দ্বারা স্থির হয়। বস্তুর ঘনত্বের অর্থ তার ওজন (বস্তুতঃ ভর) এবং আয়তনের অনুপাত। (কোনো বস্তুর ঘনত্ব বার করার জন্যে বস্তুটি ফাঁপা বা ফাঁপা নয় তা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই, শুধু সেটির ভর ও আয়তনের অনুপাত নিতে হবে। মনে রেখো বস্তুটির ঘনত্ব বস্তুটি যা দিয়ে তৈরি তার ঘনত্ব থেকে ভিন্ন হতে পারে। তাছাড়াও যতটা জল বস্তুটি সরাবে তার আয়তন থেকে বস্তুটির আয়তন জানা যায়)। একটি পিতলের পয়সার ওজন ৮০ গ্রাম এবং আয়তন ১০ সেমি^{৩} হলে তার ঘনত্ব হবে ৮ গ্রাম/সেমি^{৩}। জলের ঘনত্ব ১ গ্রাম/সেমি^{৩} অর্থাৎ ১০ সেমি^{৩} জলের ওজন মাত্র ১০ গ্রাম। পিতলের পয়সার ঘনত্ব জলের ঘনত্বের চাইতে বেশি বলে পয়সাটি ডুবে যাবে।

ধর এই পিতলের পয়সাটিকে পিটিয়ে একটা চ্যাপটা চাকতি বানানো হলো। তার ফলে পয়সার ভর (৮০ গ্রাম) বা তার আয়তন কোনোটিই পরিবর্তিত হলো না। ফলে পয়সার মত চাকতিটিও ডুবে যাবে। আরও ধরা যাক চাকতিটি দিয়ে একটি পিতলের কাপ বানানো হলো। এটি করতে গিয়ে নতুন পিতল যোগ করাও হলো না বা বাদ দেওয়াও হলো না। কিন্তু কাপের আয়তন চাক্তির আয়তনের চেয়ে বেশি হবে। কাপের সামগ্রিক আয়তনের একটি ছোটো অংশ মাত্র পিতল দিয়ে তৈরি। কাপের আয়তনের বেশির ভাগটাই কাপের মধ্যের হাওয়ার জন্যে। কাপের ভর একই থাকায় এবং আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায়, কাপের ঘনত্ব (পিতলের ঘনত্ব নয়) বহুলপরিমাণে হ্রাস পায়। এতটাই যে জলের ঘনত্বের চেয়ে কম হয়ে যাবে। পিতলে তৈরি হওয়া সত্বেও কাপটা যে জলে ভাসবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

পিতলের চাকতি এবং পিতলের কাপের ক্ষেত্রে যেটা প্রযোজ্য লোহার পাত এবং লোহার জাহাজের ক্ষেত্রেও সেটি প্রযোজ্য। একটি ইস্পাতের সূঁচ, একটি লোহার নাল একটি লোহার পয়সা প্রভৃতির ঘনত্ব জলের থেকে বেশি, তাই এগুলি ডুবে যাবে। একটি ইস্পাতের কাপ, একটি ইস্পাতের পাত্র, একটি লোহার জাহাজ প্রভৃতির ঘনত্ব জলের থেকে কম, তাই এগুলি ভাসতে থাকবে।

জলের ট্যাঙ্কে যে বলটি বলককের সঙ্গে লাগানো থাকে সেটি জলে ভাসে। এই বল তামা বা পিতলের তৈরি। এটির ভেতর সম্পূর্ণ ফাঁপা। তাই জলের চেয়ে এর ঘনত্ব কম বলে এটি ভাসে।

ভেসে থাকার বিষয়ে এই ধারণাগুলি অন্য জিনিসের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কেরোসিনের ঘনত্ব জলের চেয়ে কম। তাই কেরোসিন জলে ভাসে। আবার একটি ফাঁপা নয় এরকম লোহার গোলক জলে ডুবে যাবে কিন্তু পারদে ভাসবে। এখন কি বুঝতে পারছো কেন একটি হাইড্রোজেন ভরা বেলুন মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ওপরে উঠে যেতে থাকে? মনে রেখো বেলুনের ঘনত্ব (অর্থাৎ ফোলানো বেলুনের ভরকে তার আয়তন দিয়ে ভাগ করলে যা দাঁড়ায়) বাতাসের থেকে কম। আরও মনে রেখো জলের মত বাতাসও সব বস্তুকে ঠেলে ওপরে তুলে দেয়। (এককথায় বাতাসের ভাসমানতা আছে।)

১০। একফোঁটা তেল পড়লে কাগজ আরও স্বচ্ছ হয় কেন?

কোনো একটি বস্তুর ওপরে আলো পড়লে সেটি

তিনভাগে ভাগ হয়ে যায়—প্রতিফলন, শোষণ এবং প্রেরণ। আলোর একটি অংশ প্রতিফলিত হয় এবং বাকি অংশ যা প্রতিফলিত হয় না বস্তুটির মধ্যে ক্রমাগত শোষিত হয়ে যায়। যদি আর কোনো অংশ বাকি থাকে সেটি প্রেরিত হয় অর্থাৎ বস্তু ভেদ করে চলে যায়।

প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনার আগে পদার্থবিদ্যার একটি মৌলিক সূত্র বুঝে নেওয়া যাক্। মনে কর একটি কাঁচের চৌকোণার ওপর আলোকরশ্মি A বিন্দুতে পড়ছে (চিত্র দেখ)। আলোর একটি অংশ (I_A) প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বাকি অংশ কাঁচের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। কাঁচের অন্যপ্রান্তে মনে কর B বিন্দুতে একটি অংশ (I_B) প্রতিফলিত হচ্ছে এবং বাকি অংশ (I_T) কাঁচের মধ্যে দিয়ে বার হয়ে আসছে।
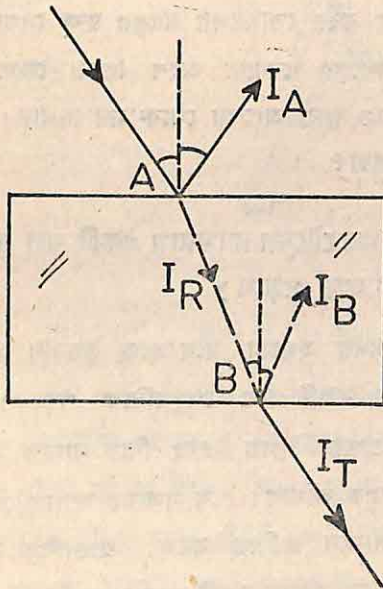
চিত্র ৫। এক টুকরো কাঁচের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আলোকরশ্মি ঢোকার এবং বেরোবার পথে (A এবং B) অংশত প্রতিফলিত ও প্রেরিত হয়।

B বিন্দুতে আলোর তীব্রতা (I_R) দুটি অংশে অর্থাৎ (I_B) এবং (I_T) তে ভাগ হয়ে যাচ্ছে।

তোমাদের হয়তো এমন একটি পরিমাণের কথা জানা আছে যার নাম প্রতিসরণাঙ্ক। এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলো তার গতিপথ পরিবর্তন করে। প্রতিসরণাঙ্ক স্থির করে দেয় আলোর এই গতি পরিবর্তন কতটা পরিমাণে হবে। এই দুটি মাধ্যমের ওপরেই তাই প্রতিসরণাঙ্ক নির্ভর করে। বাতাসের জন্যে প্রতিসরণাঙ্ক ধরে নেওয়া হয়েছে আনুমানিক এক। প্রতিটি বস্তুর প্রতিসরণাঙ্ক বাতাসের সঙ্গে তুলনা করে স্থির করা আছে। আমরা যখন বলি কাঁচের প্রতিসরণাঙ্ক ১.৫, সেটা বাতাসের তুলনাতেই।

এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাওয়ার সময় আলোর এক অংশ ঠিক সীমান্তে প্রতিফলিত হয়, বাকিটা সোজা চলে যায়। আপতিত আলোর এই বিভাজন দুটি মাধ্যমের প্রতিসরণাঙ্কের পার্থক্যের ওপর নির্ভর করে। যদি পার্থক্য বেশি হয়, আপতিত আলো জোরালো ভাবে প্রতিফলিত হবে এবং একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রেরিত হবে। অন্যদিকে স্বল্প পার্থক্য প্রতিফলনের তীব্রতা কমিয়ে দেবে এবং ফলে প্রেরিত আলোর তীব্রতা বৃদ্ধি পাবে। শেষ পর্যন্ত যখন এই পার্থক্য শূন্য হয়ে যায় বা দুটি মাধ্যম একই হয়ে যায় তখন আর সীমানা থাকে না এবং আলো অপ্রতিহত ভাবে অগ্রসর হয়।

চিত্রে I_R আলো B বিন্দুতে এসে প্রতিফলিত I_B এবং প্রেরিত I_T তে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। B বিন্দুতে আলো কাঁচ থেকে বাতাসে প্রবেশ করছে। কাঁচ এবং বাতাসের প্রতিসরণাঙ্ক যথাক্রমে ১.৫ এবং ১। ফলে খানিকটা অংশ প্রতিফলিত হচ্ছে বাকিটা প্রেরিত হচ্ছে। মনে কর কাঁচের চৌখুপীটি এবার জলে

ডুবিয়ে রাখা হলো। তাহলে B বিন্দুতে আলো কাঁচ থেকে জলে প্রবেশ করবে। জলের প্রতিসরণাঙ্ক প্রায় ১.৩। দুই প্রতিসরণাঙ্কে পার্থক্য দাঁড়ালো ০·২ (অর্থাৎ ১·৫—১·৩)। অথচ কাঁচটি যখন বাতাসে ছিল তখন এই প্রতিসরণাঙ্কের পার্থক্য ছিল ০·৫। এই কম পার্থক্যের মানে হলো এখন অনেক বেশি পরিমাণ আলো জলের মধ্য দিয়ে প্রেরিত হচ্ছে এবং ফলে কম পরিমাণ আলো কাঁচের চৌকোণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসছে।

তোমরা জানো কাগজ তৈরি হয় তন্তুময় বস্তু দিয়ে। এই তন্তুগুলি বাক্সে আঁটা চকখড়ির মতো, আঁটো অবস্থায় থাকে না। এই কাগজের তন্তুগুলি এলোমেলো এবং আল্‌গা ভাবে গোছা করা থাকে যাতে কাগজের মধ্যে অনেকগুলি হাওয়া-থলি তৈরি হয়। যখন কাগজে আলো পড়ে তার একটি অংশ কাগজের ওপর ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে এবং বাকি অংশ কাগজের মধ্যে প্রবেশ করে। কাগজটি সমপ্রকৃতির না হওয়ায় কাগজের মধ্যের আলো দুটি ভিন্ন মাধ্যমের মিশ্রণ দেখতে পায়, একটি হলো কাগজের তন্তু এবং অন্যটি হাওয়া-থলি। বাতাসের প্রতিসরণাঙ্ক কাগজ জাতীয় পদার্থের প্রতিসরণাঙ্কের থেকে আলাদা। ফলে কাগজের মধ্যে দিয়ে আসা বেশির ভাগ আলোর বাধাপ্রাপ্ত প্রতিফলন হয়। এই পর্যায়ক্রমিক প্রতিফলনের জন্যে খুব কম আলো কাগজের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে। তাই কাগজেকে প্রায় অনচ্ছ মনে হয়। তাছাড়া সামান্য আলো প্রতিফলিত হয় বলে, কাগজের উপরি চক্‌চকে দেখায়।

এখন দেখা যাক্‌ কাগজে এক ফোঁটা তেল পড়লে কি হয়। তেলটি কাগজে ছড়িয়ে পড়ে এবং একটি অংশ শুষে নেয়। তার মানে কিছু হাওয়া-থলি তেল দিয়ে ভরে যায়। ফলে কাগজের ওপর পড়া আলো, বাতাস এবং কাগজের পরিবর্তে তেল এবং কাগজ জাতীয় পদার্থের মুখোমুখি হয়। বাতাস এবং কাগজের প্রতিসরণাঙ্কের চেয়ে তেল এবং কাগজের প্রতিসরণাঙ্ক পরস্পরের কাছাকাছি। দুই প্রতিসরণাঙ্ক অল্প পার্থক্য বলে খুব কম পরিমাণ আলো প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় এবং বেশির ভাগ আলো ভেতর দিয়ে চলে যায়। তাই কাগজ আলোক দ্বারা ভেদ্য কিম্বা ঈষদচ্ছ (বা কম অনচ্ছ) হয়ে যায়। তোমরা এও লক্ষ্য করবে তেল লাগা কাগজের চক্‌চকে ভাব অনেক কমে যায় এবং নিষ্প্রভ দেখায়। কেন এমন হয়?

প্রতিদিনকার জীবনযাত্রায় তোমরা এ জিনিস দেখতে পাবে। তোমরা যে সার্ট গায়ে দাও তা স্বচ্ছ নয়। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে গেলে জলভেজা সার্ট ভেদ করে তোমাদের গায়ের ত্বক্‌ দেখা যায়। রঙিন কাপড়ের কোনো অংশ ভিজে গেলে সেই অংশের রঙ অন্য অংশের থেকে ঘন দেখায়। কেন বলতে পারো?

১১। চলন্ত ট্রেনের কামরায় একটি বল ছুঁড়লে বলটি কোথায় পড়বে?

তোমাদের হয়তো মনে হচ্ছে উত্তরটা হবে যে বল ছুঁড়ছে বলটি তার পেছনদিকে পড়বে। এও ভাবছো ওপরে উঠতে এবং নিচে নামতে বলটির কিছুটা সময় লাগবে। যে সময়ের মধ্যে ট্রেনে করে লোকটি সামনে এগিয়ে যাবে। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে যে তাহলে বলটি তার পেছনদিকে পড়বে।

এটা নিয়ে তর্ক না করে পরের বার ট্রেনে চড়ে যাওয়ার সময় এই পরীক্ষা করে দেখো না কেন? দেখে অবাক হবে যে ঠিক যেমন খেলার মাঠে ঘটে
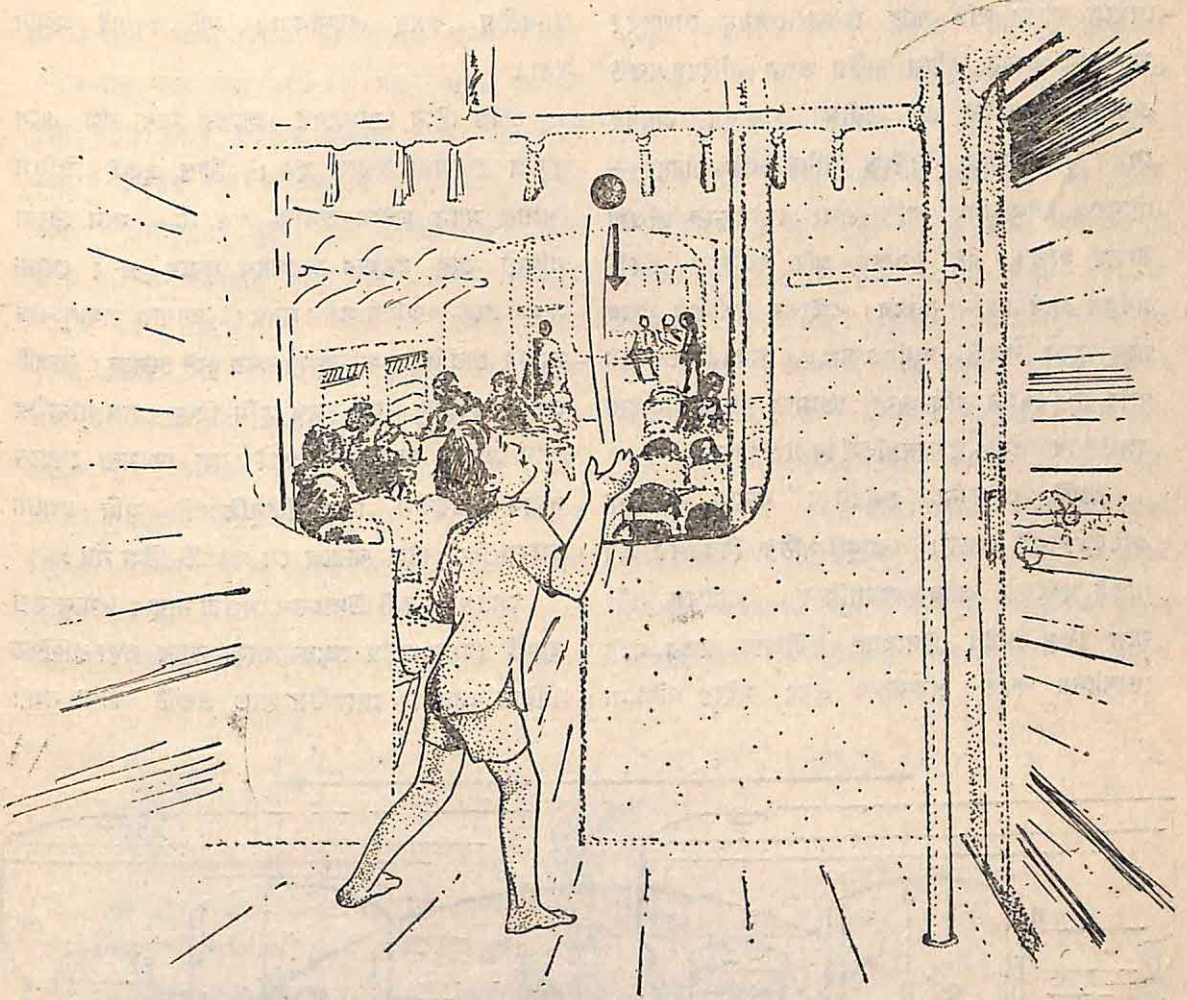
চিত্র ৬ (ক)। ট্রেনের কামরার মধ্যে একটি লোকের কাছে বলটি ওপরে যাবে এবং নিচে আসবে।

এখানেও তেমনি বলটি সোজা তোমাদের হাতে এসে পড়বে? তোমাদের আগের যুক্তিতে ভুল কোথায়?

চলন্ত ট্রেনে ট্রেনের মধ্যের সববস্তুতেই ট্রেনের গতি সঞ্চারিত হয়। ফলে ট্রেনের পাখা, স্যুটকেশ, যাত্রীরা, তোমরা নিজেরা এবং হাতের বল সকলেই ট্রেনের সমান গতিতে চলতে থাকে। বলটি ওপরে ছুঁড়লে ট্রেনের থেকে পাওয়া এই গতি কিন্তু তার নষ্ট হয়ে যায় না। ট্রেনের সঙ্গে এবং তোমাদের সঙ্গেও একতালে সে চলতে থাকে। শুধু তার আনুভূমিক গতির সঙ্গে একটি উল্লম্বগতি অর্জন করে মাত্র। ফলে বলটি ওপর নিচু করার সময় একই সঙ্গে আনুভূমিক ভাবে তোমাদের সঙ্গে তাল রেখে গতি বজায় রাখে। সেইজন্যে বলটি সোজা এসে হাতের মধ্যে টুপ্ করে পড়ে।

ট্রেনের মধ্যে তোমরা যে বলটিকে আনুভূমিক চলতে দেখতে পাও না তার কারণ বলটি তোমাদের সঙ্গে একই তালে চলছে। তোমরা শুধু দ্যাখো বলটি ওপর নিচ করছে। ট্রেনের বাইরে থেকে কেউ

দেখলে বলের গতি তার চোখে কেমন দেখাবে? মনে কর ট্রেনের বাইরে মাটির ওপর দাঁড়িয়ে কেউ একজন তোমাদের এই পরীক্ষা দেখছে। আগেই যেমন বলা হয়েছে বলটিতে দ্বিবিধ গতি থাকছে—ট্রেনের আনুভূমিক গতি এবং তোমাদের দেওয়া উল্লম্ব গতি। এই দুরকম গতি বলটিকে একটি অর্ধবৃত্ত পথে চালনা করবে। বাইরের দর্শকের কাছে মনে হবে বলটি অর্ধবৃত্তপথে চলছে। ভেতরের দর্শকরা (যেমন তুমি এবং তোমার বন্ধুরা) অবশ্য বলটির কেবলমাত্র উল্লম্বগতিই দেখতে পাবে।

বলটি ওপরনিচ চলাফেরা করছে না কি অধিবৃত্তপথেই চলছে। কোন্‌টি সঠিক বিবরণ? সব গতিই দর্শকের কাছে আপেক্ষিক। অনপেক্ষ গতি বলে কিছু নেই। উপরোক্ত পরীক্ষায় বলের গতি তোমাদের কাছে একরকম এবং বাইরে দাঁড়ানো লোকটির কাছে একরকম। দুটি বর্ণনাই সমান সত্য।

চলন্ত ট্রেনে তোমাদের হাতের মধ্যে বল এসে পড়লে তোমরা অবাক হও। কিন্তু একই জিনিস খেলার মাঠে ঘটলে অবাক হও না। মনে রেখো পৃথিবী তার অক্ষের চারপাশে ঘুরছে এবং ঘোরা সম্পূর্ণ হতে একদিন সময় লাগে। আবার মহাশূন্যেও সূর্য্যের চারদিকে পরিক্রমণ করে ছুটে চলেছে। 'বলটি ওপরে ছোঁড়ার সাথে সাথে তুমি কিন্তু চলন্ত পৃথিবীর টানে এগিয়ে যাচ্ছ এবং তাই বল তোমার পেছনে পড়বে'—এরকম কিছু ফিস্‌ফিসানি যদি শোনো তাহলে কি বুঝতে পারলে সে কথাটি ঠিক নয়?

আরও একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্‌। মনে কর একটি ছেলে ওপর থেকে খাড়া ভাবে পড়া বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটির হাতে একটি ফাঁপা নল।
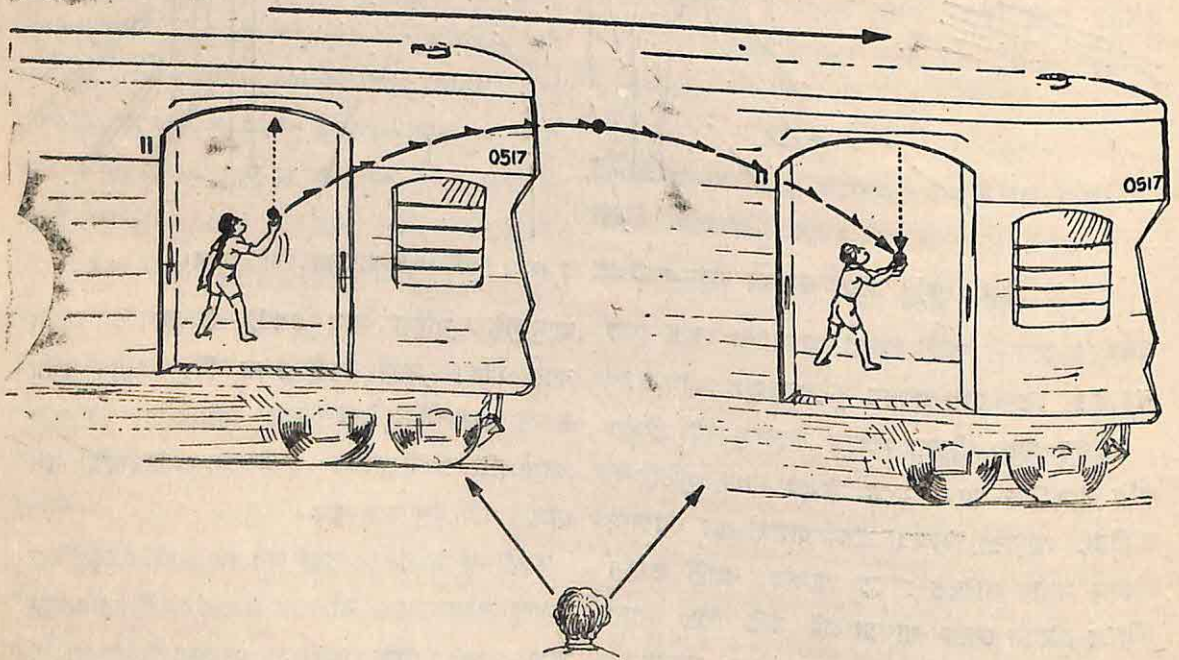
চিত্র ৬ (খ)। বাইরের মাঠের একটি লোকের কাছে বলটি চলে যায় একটি অধিবৃত্ত পথে।

সে দেখবে এই নলটি লম্বভাবে ধরে রাখলে বৃষ্টির ফোঁটা তার মধ্যে দিয়ে বিনাবাধায় ঢুকে যাবে। এককথায় বলা যায় নলটি যে ভাবে ধরে থাকলে তার মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির ফোঁটা চলে যাবে তার থেকেই বৃষ্টির গতিপথ অনুমান করা যায়। এখন যদি সে দৌড়োতে সুরু করে তাহলে নলের মধ্যে দিয়ে বৃষ্টির যাওয়ার জন্যে তাকে নলটি বেঁকিয়ে ধরতে হবে (চিত্র ৬ গ)। ফলে সে সিদ্ধান্ত করবে বৃষ্টি সোজা না পড়ে বেঁকে পড়ছে। মনে রেখো এই দুই পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রেই বৃষ্টিতে কোনো পরিবর্তন ঘটছে না। বৃষ্টির গতি পৃথকভাবে দেখা হচ্ছে কারণ পর্যবেক্ষক নিজেই চলতে সুরু করছে। অর্থাৎ কোনো গতির বর্ণনা পর্যবেক্ষকের গতির সঙ্গে পরিবর্তিত হবে।

যদি মনে রাখো পৃথিবীর সঙ্গে তার ওপরের সব বস্তুই ঘুরছে তাহলে এখন বুঝতে পারবে তোমাদের কিছু কিছু শৈশবস্বপ্ন অবাস্তব কেন? ছোটোরা অনেক সময় মনে করে বিনাখরচায় বিশাখাপত্তনম্ থেকে বোম্বাই যাওয়া সম্ভব। ধরা যাক্ একটা গ্যাস বেলুনে চড়ে বিশাখাপত্তনমের ১০০০ মিটার ওপরে উঠে গেলে। নিচে পৃথিবী ঘুরছে। যেই দেখবে বোম্বাই এর ওপরে তুমি আছো অমনি বেলুনের গ্যাস বার করে দাও। তাহলেই অতি সহজে আরাম করে নিখরচায় ভ্রমণের শেষে বোম্বাই পৌঁছে যাবে। তাতো বটেই! তবে পৃথিবীর ওপরের বস্তুসমূহ এমনকি যেগুলি বাতাসে থাকে সেগুলিও পৃথিবীর সঙ্গে ঘুরতে থাকে। এই তথ্যটি না বুঝেই ভ্রমণ পরিকল্পনা করা হয়েছে। তোমাদের বেলুন যদি স্থির থাকে (অর্থাৎ বাতাসের সঙ্গে এদিক ওদিক সরে না যায়) তাহলে সেটি সারাক্ষণই বিশাখাপত্তনমের ওপরে
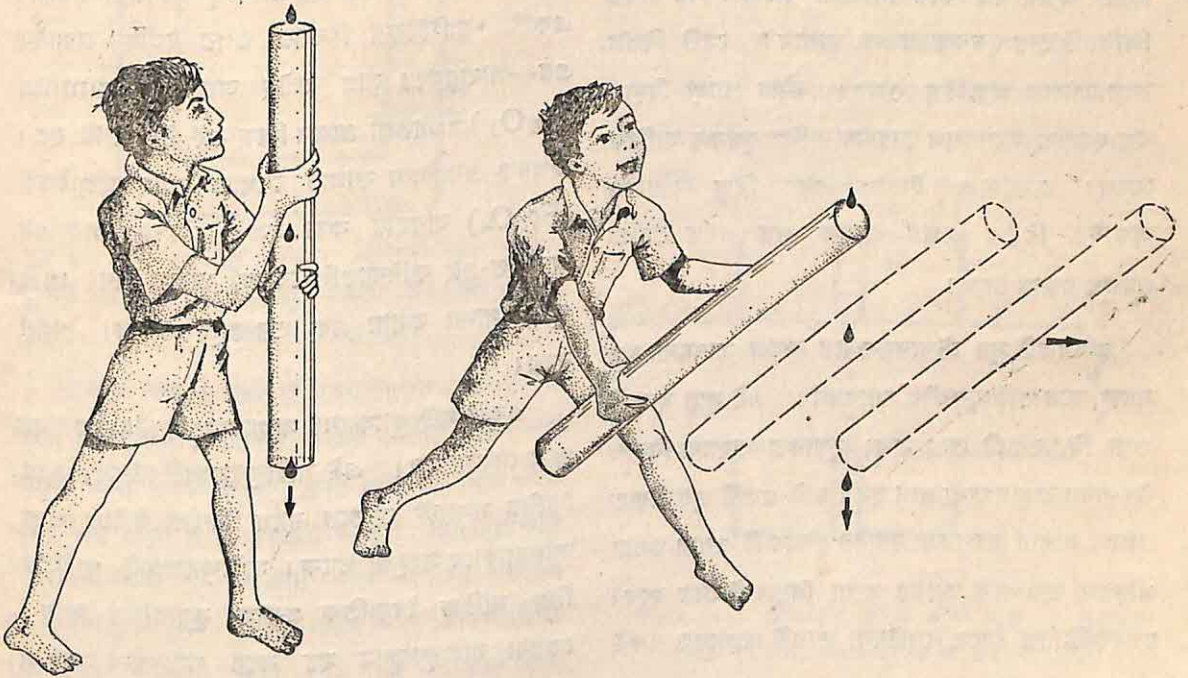
চিত্র ৬ (গ)

থাকবে। এই কারণে প্রচুর পরিমাণে ব্যয়সাপেক্ষ জ্বালানীর সাহায্যে উচ্চশক্তিসম্পন্ন জেট ইঞ্জিন আকাশ ভ্রমণের জন্যে ব্যবহার করতে হয়।

১২। টেপ রেকর্ডার কেমন ভাবে চলে?

টেপরেকর্ডার একটি পদ্ধতি যা ধ্বনি ধরে রাখে এবং পুনরুৎপাদন করে। এই পদ্ধতি তড়িৎ এবং চুম্বকত্বের কয়েকটি সূত্রকে কাজে লাগায়। এই সূত্রগুলি কি তা দেখা যাক।

বিদ্যুৎ প্রবাহ সবসময়েই একটি চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি করে। প্রবাহটি যদি কুণ্ডলীকৃত বিদ্যুৎবাহী তারের মধ্যে দিয়ে যায় তবে ঐ গোটানো তারের ভেতরে এবং বাইরে একটি চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়। যদি লোহার তৈরি কোনো জিনিস তারের মধ্যে রাখা হয় তবে সেটি চৌম্বক গুণ প্রাপ্ত হয়। তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়ার কতক্ষণ পর পর্যন্ত জিনিসটি তার চুম্বকত্ব বজায় রাখবে? সেটি নির্ভর করে লোহার প্রকৃতির ওপর। কাঁচা লোহা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আরোপিত চুম্বকত্ব হারিয়ে ফেলে। অন্যদিকে ইস্পাত এবং কিছু লোহার অক্সাইড বিদ্যুৎ বন্ধের অনেক পর পর্যন্ত তাদের চুম্বকত্ব বজায় রাখে।

আরেকটি সূত্র টেপরেকর্ডারে কাজে লাগানো হয় যাকে বলে তড়িচ্চুম্বকীয় আবেসন। এই সূত্রে কুণ্ডলী করা বিদ্যুৎবাহী তার এবং চুম্বকের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার কথা বলা হয়। যদি একটি কুণ্ডলীকৃত তারের মধ্যের অক্ষরেখা বরাবর চুম্বকটি এধার ওধার নাড়ানো হয় তবে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। চুম্বকটি স্থির রেখে, গোটানো তারটি নাড়ালেও একই ফল পাওয়া যাবে।
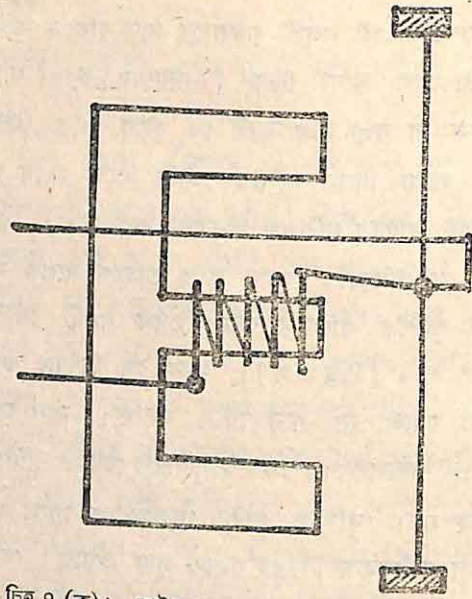
চিত্র ৭ (ক)। মাইক্রোফোনের মধ্যে ডায়াফ্রাম ও স্থায়ী চুম্বকের ওপর কুণ্ডলীকৃত তার।

তোমরা বোধহয় জানো টেপ রেকর্ডারের ভেতর যে টেপ ব্যবহার করা হয় তাকে চুম্বকীয় টেপ বলে। একটি প্লাস্টিকের ফিতের ওপর লৌহ অক্সাইড এর—সাধারণতঃ লাল লৌহ অক্সাইড (gamma Fe_2O_3)—পাতলা প্রলেপ দিয়ে এই টেপ তৈরি হয়। কখনও একরকম কালচে দেখতে লৌহ অক্সাইডও (Fe_3O_4) ব্যবহার করা হয়। টেপের ওপর এই অক্সাইড-এর কণিকাগুলি কেকর্ড করায় এবং ধ্বনি পুনরুৎপাদন করায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

একটি মাইক্রোফোনের সাহায্যে ধ্বনি টেপরেকর্ডারে ভরে দেওয়া হয়। এই মাইক্রোফোনটি টেপরেকর্ডার তৈরির সময়েই ভেতরে রাখে কিংবা বাইরে থেকে আলাদাভাবে সংযুক্ত থাকে। মাইক্রোফোনটি ধ্বনিকে ভিন্ন মাত্রিক বৈদ্যুতিক প্রবাহে রূপান্তরিত করে। কোনো মাইক্রোফোন যত্ন করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পাবে একটি পর্দা বা জাল বা পাতলা ঝিল্লির

মত কিছু তারের সঙ্গে আটকানো থাকে। এই তার আবার একটি স্থায়ী চুম্বকে জড়ানো থাকে। মাইক্রোফোনের সামনে ধ্বনি সৃষ্টি হলে পর্দাটিতে কম্পন হয়। কম্পনশীল পর্দাটি তারটিকে স্থায়ী চুম্বকের ক্ষেত্রের মধ্যে এদিক থেকে ওদিকে নাড়াতে থাকে। ফলে তারের মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ প্রবাহ খুবই ক্ষীণ থাকার জন্যে একটি অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে প্রবাহটিকে জোরদার করা হয়। এই জোরালো প্রবাহটি রেকর্ড করার যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত তারের মধ্যে পাঠানো হয়।
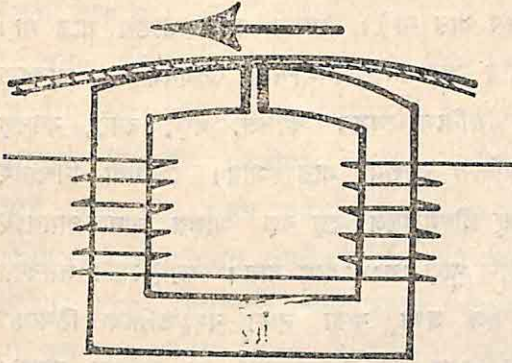
চিত্র ৭ (খ)। রেকর্ডিং হেড। ফাঁকের মধ্য দিয়ে টেপটি চলে যায়। অশ্বক্ষুরাকৃতি নমনীয় লৌহখণ্ডের ওপর দিয়ে তার রয়েছে কুণ্ডলীকৃত হয়ে।

রেকর্ড করার যন্ত্রটি টেপরেকর্ডারের এমন একটি অংশ যেখানে ধ্বনি রেকর্ড করার কাজটি ঘটে। এই যন্ত্রের মধ্যে একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি কাঁচা লৌহখণ্ড থাকে এবং এর গায়ে তার জড়ানো থাকে। অশ্বক্ষুরাকৃতি বস্তুটির মধ্যে খুব সামান্য ফাঁক থাকে। তারের মধ্যে দিয়ে পাঠানো বিদ্যুৎ প্রবাহ কাঁচা লৌহখণ্ডটিতে চৌম্বকত্ব আরোপ করে এবং সেটি সাময়িকভাবে অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বকে পরিণত হয়। চৌম্বক শক্তির মাত্রা বিদ্যুৎ প্রবাহের শক্তির পরিমাণের ওপর নির্ভর করে। সেটি আবার মাইক্রোফোনে ধ্বনির তীব্রতার ওপর নির্ভরশীল। অশ্বক্ষুরাকৃতি লৌহখণ্ডের ফাঁকের ওপর দিয়ে যখন চৌম্বক টেপটি যায় তখন টেপের ওপরের লৌহ অক্সাইডের স্তরের একটি অংশ চৌম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়। চৌম্বকত্বের শক্তি ধ্বনি তীব্রতার ওপরে নির্ভর করে।

রেকর্ড করা ধ্বনি পুনরায় বাজানোর জন্যে টেপটি আবার জড়িয়ে রাখা হয় এবং আবারও একই গতিতে সেটি খুলতে থাকার কাজটি চালানো হয়। ওপরে যে পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে এবার ঠিক তার উল্টোটি ঘটে। মনে রেখো টেপ বাজানোর সময় মাইক্রোফোন বন্ধ থাকে। রেকর্ড করার যন্ত্রের মাথার ফাঁকটির ওপর দিয়ে যখন টেপটি যায় তখন টেপের চৌম্বকত্ব শক্তির সমমাত্রিক বৈদ্যুতিক প্রবাহ তারের মধ্যে তৈরি হয়। এই প্রবাহ অ্যামপ্লিফায়ারের মধ্যে দিয়ে জোরালো করে লাউডস্পীকারে পাঠানো হয়। লাউডস্পীকার স্বরতারের মধ্যের পরিবর্তমান বিদ্যুৎ প্রবাহকে ধ্বনিতরঙ্গে পরিণত করে আগের থেকে ধরে রাখা ধ্বনিকে পুনরুৎপাদন করে।
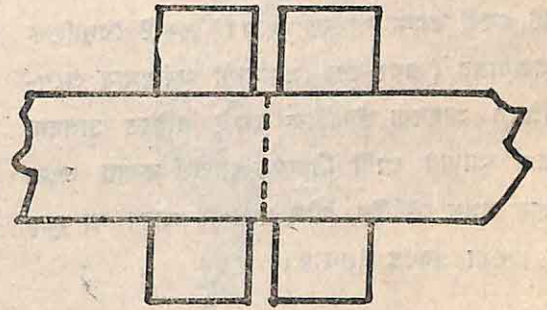
চিত্র ৭ (গ)। রেকর্ডিং হেডের ফাঁক দিয়ে ঐ টেপটিকে অবশ্যই নির্ভাজ এবং অকুঞ্চিত অবস্থায় যেতে হবে।

টেপরেকর্ডারের একটা মস্ত সুবিধে হচ্ছে একই টেপ বার বার বাজানো যায়। যখন ইতিমধ্যেই
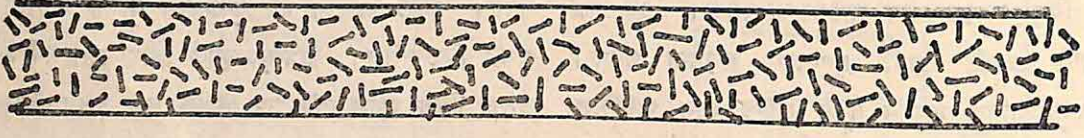
চিত্র ৭ (ঘ) চৌম্বক তারের একটি সূঁচাকৃতি কণিকার আবরণ থাকে। ওপরের টেপটি পরিচ্ছন্ন, কণিকাসমূহ সর্বমুখী হয়ে আছে। নিচের টেপের মধ্যে ধ্বনি রেকর্ড হয়েছে যেখানে সেখানেই কণিকাগুলি সারিবদ্ধ সাজানো।

ধ্বনি রেকর্ড করে রাখা টেপটি আবার নতুন করে রেকর্ড করার জন্যে ব্যবহার করা হয় তখন টেপটি রেকর্ড করা যন্ত্রের ওপর দিয়ে চলার সময় আপনা-আপনিই তার প্রতিটি অংশের থেকে আগের ধ্বনি মুছে যেতে থাকে। মাইক্রোফোনের থেকে আসা নতুন সঙ্কেত তখন টেপটিকে আবার উপযুক্ত ভাবে চৌম্বকত্ব দেয়।

টেপরেকর্ডার কেমন ভাবে কাজ করবে তা নির্ভর করে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর। যে গতিতে টেপটি রেকর্ড যন্ত্রের ওপর দিয়ে চলবে সেটি একই রকম থাকতে হবে। একটি বৈদ্যুতিক চালকযন্ত্রের (এবং তার সহযোগী ঘূর্ণায়মান অংশ-গুলির) সাহায্যে টেপটিকে একই গতিতে চালানো হয়। আবার ধ্বনি ঠিকমত রেকর্ড করার জন্যে চলার সময় টেপটির ভাঁজ হয়ে না থাকা বা মুড়ে না যাওয়া একান্ত দরকার।

১৩। অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র কেমন ভাবে কাজ করে?

তোমরা জানো দহন একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেখানে দগ্ধ বস্তুগুলি দ্রুত অক্সিজেনের সঙ্গে মিশে যায়। দহনের ফলে প্রচুর উত্তাপ এবং আলো সৃষ্টি হয়। সব বস্তুই দাহ্য নয় (অর্থাৎ সেগুলিতে আগুন ধরে না)। যেমন জলে আগুন ধরে না। আবার আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ব্যবহৃত বহু জিনিসে যেমন কাগজ, খড়, কাঠ, কাপড় ইত্যাদিতে আগুন ধরে যায়। তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ গ্রীষ্মকালে বড় বড় খড়ের গাদা প্রায়শঃই আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। তাই যেটা দরকার তা হল জমা করা দাহ্য বস্তুগুলিকে ঠিকমত রাখা এবং আগুন লাগলেই তা নিবিয়ে ফেলা। কিন্তু কেমন করে আগুন নেবানো হয়?

আগুন জ্বলার জন্যে কিছু দাহ্য বস্তু এবং অক্সিজেনের বেশ পরিমাণ যোগান দরকার এটা তোমাদের জানা। অক্সিজেনের যোগান বন্ধ করে দেওয়া এবং যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্যে দাহ্য বস্তুগুলিকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া এ দুটিই হলো মূল নীতি। আরও একটি দরকারী বিষয় আছে। ধর, তোমরা যে বই পড়ছো সেটি কাগজে তৈরি এবং ঘরেও যথেষ্ট অক্সিজেন। আছে। তাহলে বইয়ে আগুন ধরছে না কেন? কোনো দাহ্য বস্তুতে তখনই অগুন ধরে যায় যখন

তার তাপমাত্রা জ্বলনাঙ্কের থেকে বেশি হয়। এই তাপমাত্রার কমে বস্তু পুড়তে পারে না। তাই তাপমাত্রা নামিয়ে দেওয়া বা জ্বলন্ত বস্তুটিকে ঠাণ্ডা করে দেওয়ার দ্বারাও অগ্নিনির্বাপন সম্ভব।

আগুন নেবানোর একটি সাধারণ পদ্ধতি হচ্ছে আগুনের ওপর জল ঢালা। ফায়ার ব্রিগেডের অগ্নিনির্বাপক ইঞ্জিনগুলি আগুনকে আয়ত্ত করতে জ্বলন্ত বাড়ির ওপরে লম্বা নলের সাহায্যে তীব্র বেগে জল ঢালে। জল এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ করে। জল উত্তাপ শুষে নেয় আর তাই দাহ্য বস্তুটির তাপমাত্রা কমিয়ে আনে। আশেপাশের বাড়ি থেকে জল ঢালার দরুণ আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

অবশ্য সবসময়ে ফায়ার ব্রিগেড ডাকা সম্ভব হয় না এবং সৌভাগ্যক্রমে দরকারও করে না। তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো অনেক বাড়িঘর, কলকারখানা, বাস্, স্কুল, ল্যাবরেটরী, সিনেমা হলে লালরঙের এক ধরণের গোলাকৃতি বা তিন কোণা জিনিস থাকে যেগুলিকে অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম বলা হয়। এগুলি কি ভাবে কাজ দেয়? আমরা ওপরে যেমন বলেছি সেই ভাবেই কাজ করে শুধু তার কাজ করার ধরণটা বিভিন্ন অগ্নিনির্বাপকের ক্ষেত্রে বদলে বদলে যায়।

সবচেয়ে সহজতম অগ্নিনির্বাপকে উচ্চচাপে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ভরা থাকে। এই চাপ এত বেশি থাকে যে খানিকটা কার্বন ডাই-অক্সাইড তরল পদার্থে পরিণত হয়। নির্বাপকের মুখটি খুলে দিলেই তীব্র ধারায় কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস বার হয়ে আসে। সেটি আগুনের দিকে তাক্ করা থাকে। বাতাসের চাইতেও ভারি, ঘন কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস আগুনের চারপাশের অক্সিজেন সরিয়ে সেখানে জমা হতে থাকে। জ্বলন্ত বস্তুতে অক্সিজেনের যোগান বন্ধ হয়ে যায় এবং আগুন নিবে যায়। মনে রেখো কার্বন ডাই-অক্সাইড দহন কার্যে বা আগুন জ্বলতে কোনো সাহায্য করে না।

আর একরকম নির্বাপক যন্ত্রে তীব্র ধারায় জল বার করার জন্যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এতে অবশ্য তৈরি কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকে না। এর মধ্যে থাকে সোডিয়াম বাই-কার্বোনেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের মত রাসায়নিক পদার্থ যার সংমিশ্রণে কার্বন ডাই-

চিত্র ৮। জল ঝরা অগ্নিনির্বাপকে থাকে জলেসোডিয়াম বাই কার্বোনেটের মিশ্রণ এবং এক বোতল নিরেট H_2SO_4। এই দুইয়ের সংমিশ্রণে Co_2 তৈরি হয়। এর ফলে তীব্র গতিতে জল বেরিয়ে এসে আগুন নিভিয়ে দেয়।
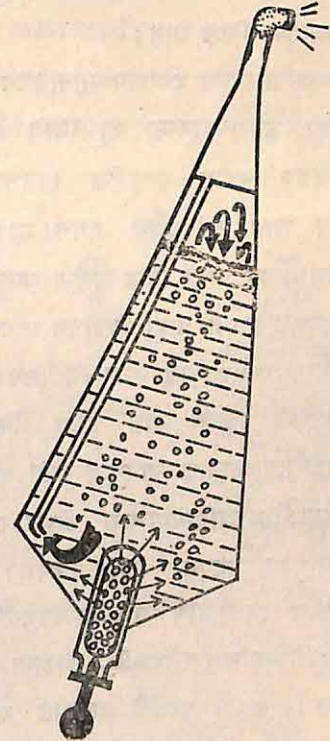
অক্সাইড তৈরি হয়। জলের মধ্যে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের মিশ্রন একটি কোণাকৃতি আধারে ভরা থাকে। আধারটিতে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড মুখবন্ধ বোতলে ভরা অবস্থায় থাকে (চিত্র ৮)। এই নির্বাপকটি ব্যবহার করতে চাইলে শুধু মুখটি দেওয়ালে ধাক্কা মেরে আঘাত করতে হবে। ভেতরের সালফিউরিক অ্যাসিডের বোতল ভেঙ্গে গিয়ে দুটি রাসায়নিক বস্তু একত্রিত হবে এবং প্রচুর কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি করবে। কার্বন ডাই-অক্সাইডের চাপে তীব্র বেগে রাসায়নিক সংমিশ্রণটি বেরিয়ে আসবে। এই তীব্র ধারার বেশির ভাগটাই যেহেতু জল ফলে জ্বলন্ত বস্তু থেকে উত্তাপ শুষে নেয় এবং আগুন নিবে যায়।

আগুনে অক্সিজেনের যোগান নানাভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায়। যেমন ফেনা বা মিহি পাউডারের পাতলা আস্তরণ জ্বলন্ত বস্তুটির চারপাশে ঢেকে দিলে আগুন আর অক্সিজেন পাবে না। আরও দুটি অগ্নিনির্বাপকের কথা নিচে বর্ণনা করা হলো— এর একটি হলো ফেনা দ্বারা নির্বাপন এবং অন্যটি শুক্নো রাসায়নিক গুড়োর দ্বারা নির্বাপন। এদের নামগুলি থেকেই বোঝা যায় ঠিক কি পদার্থ আগুনের চারপাশে ছড়াতে ব্যবহার করা হয়।

ফেনা জাতীয় অগ্নিনির্বাপকে এমন রাসায়নিক পদার্থ থাকে যা ফেনা তৈরি করে। এরকম ফেনা নির্বাপকে সোডিয়াম বাই কার্বোনেটের মিশ্রণ এবং অ্যালুমিনিয়াম সালফেট্ আলাদা আলাদা মজুত থাকে। যখন যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়, এই রাসায়নিক পদার্থগুলি একটি বিশেষ কৌশলে মিশে যায়। মিশ্রণটি নির্বাপক থেকে বাইরে এসেই বাতাসের সংস্পর্শে ফেনা তৈরি করে। আগুনের ওপর এই ফেনা নিক্ষিপ্ত হয়।

আর একটি হলো পাউডার জাতীয় নির্ব্বাপক যার মধ্যে শুষ্ক এবং অতি মিহি পাউডারের মত সোডিয়াম বাই কার্বোনেট, মোনো অ্যামোনিয়াম ফস্ফেট প্রভৃতি অগ্নিনির্বাপক বস্তু ভর্তি একটি সিলিণ্ডার থাকে। এই রাসায়নিক পদার্থগুলি আধারে ভরা হয় বাতাসের উচ্চচাপে। আগুন নেবাতে হলে যন্ত্রটির মাথার ওপরের হাতলটিতে চাপ দিলেই তীব্র বেগে এই পাউডার আগুনের ওপর পড়তে থাকে। পাউডারের এই আস্তরণ আগুন জ্বলতে বাধা সৃষ্টি করে এবং আগুন নিবোতে সাহায্য করে।

আগুন খুব স্বল্প হলে এবং হাতের কাছে কিছুই না পেলে আগুনের ওপর মাটি বা বালি ফেলা হয়।

ঘন জঙ্গলের মধ্যে আগুন লাগলে কি হয় জানো? আগুন নেবানো গাড়ি ঐ জঙ্গলে ঢুকতে পারে না, আশেপাশে জলও থাকেনা। এই অবস্থায় সব শুক্নো ডালপালা আগুনের চারপাশ থেকে সরিয়ে ফেলে বা দরকার মতো কিছু গাছ কেটে ফেলে আগুনকে ছোটো জায়গায় আটকে ফেলা হয়।

আরেকটা মজার ব্যাপার হলো আগুন নিবোতে আগুন ব্যবহার করা। কোনো তৈলকূপে আগুন ধরে গেলে শক্তিশালী বিস্ফোরকের সাহায্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ঐ কূপের দেয়াল ভেঙ্গে ফেলা হয়।

১৪। হীরে এত কঠিন এবং ঝক্ঝকে কেন?

তোমরা কি জানো একটি কঠিন এবং ঝক্ঝকে হীরে রাসায়নিক অর্থে কতকগুলি কার্বন পরমাণুর সমষ্টি মাত্র? ৭০০° সেন্টিগ্রেড উত্তপ্ত একটি হীরে একটুক্রো কয়লার মত জ্বলবে আর তার থেকে তৈরি হবে কার্বন ডাই অক্সাইড (Co_2)। এটি অবশ্য একটি ব্যয় সাধ্য পরীক্ষা।

তোমাদের অবাক লাগতে পারে যে কয়লা—সেটিও মূলতঃ কার্বন--এবং হীরে এই দুটির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য একেবারে পুরোপুরি বিপরীত কেন? যেমন এদের চেহারায়, কাঠিন্যে এবং দামে এত তফাৎ! কয়লা নরম—হাতে নিলে তোমাদের হাতে কালি লেগে যায়। অন্যদিকে হীরে প্রচণ্ড কঠিন। পৃথিবীর প্রাকৃতিক পদার্থের মধ্যে হীরেই সবচাইতে কঠিন। হীরে এত কঠিন হয় কি করে?

কোনো বস্তু নরম হবে কি কঠিন হবে তা নির্ভর করে এর পরমাণু বা অণুগুলি কতখানি জোরালো ভাবে পরস্পর সংবদ্ধ তার ওপর। যত জোরে তারা সংযুক্ত থাকে বস্তুটি তত কঠিন হয়। যেমন টাংস্ট্যান ধাতুর পরমাণুগুলি খুব দৃঢ়ভাবে পরস্পর সংযুক্ত থাকে। ফলে সেটি খুবই কঠিন হয়ে ওঠে। অপরদিকে পরমাণুর শিথিল সংযুক্তি বস্তুটিকে নরম করে তোলে। যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি। নরম বস্তুতে অল্প জোর প্রয়োগ করেই তার অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন করা যায়, (যেমন স্পর্শমাত্র কয়লা থেকে তোমাদের হাতে কালি লেগে যায়)। পাথর, লোহা বা দামী হীরের মত কঠিন বস্তু ভাঙ্গতে অনেক বেশি জোর প্রয়োগ করতে হয়।

পরমাণু বা অণুগুলি কতখানি জোরে সংবদ্ধ আছে সে প্রশ্নছাড়াও সেগুলি বস্তুটির মধ্যে কি ভাবে সাজানো আছে সেটিও গুরুত্বপূর্ণ। মনে কর যেন একগোছা তাস। যে কোনো একটি তাস পল্‌কা, সহজে ছিঁড়ে ফেলা যায়। কিন্তু বাহান্নটি তাসের গোছাকে তোমরা বোধকরি ছিঁড়ে ফেলতে পারো না। অবশ্য তাসগুলিকে সহজেই আলাদা করা যায় বা এলোমেলো করে দেওয়া যায়। গ্রাফাইট বলে একরকম কার্বন আছে যা ঠিক একগোছা তাসের মত। প্রতিটি স্তরে কার্বনের পরমাণুগুলি অত্যন্ত কঠিন ভাবে পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ কিন্তু এই স্তরগুলিকে, প্রত্যেকটিকেই সহজে ওপর নিচ করে সাজানো যায়। এইজন্য গ্রাফাইটকে পিচ্ছিল তেল হিসেবে কাজে লাগানো হয়। সাধারণ একখণ্ড কয়লার পরমাণুগুলি শিথিলভাবে একত্রিত থাকে। তাই যে কোনো দিকে চাপ দিলেই সেটি সহজে ভেঙ্গে ফেলা যায়।

হীরে একখণ্ড কয়লার মত এরকম পরমাণুর স্তূপ নয়, আবার গ্রাফাইটের মত এর বিভিন্ন স্তরভিত্তিক গঠনও নয়। বরং এর মধ্যে কার্বন পরমাণুগুলির যে কোনো দিকেই সুসংবদ্ধ ত্রিমাত্রিক কাঠামো রয়েছে। এই জন্যেই হীরে এত কঠিন।

হীরের গঠন প্রকৃতির দিকে লক্ষ্য কর (চিত্র ৯ (ক))। দ্যাখো প্রত্যেকটি কার্বন পরমাণু আরও চারিটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত। পরমাণুগুলির মধ্যে
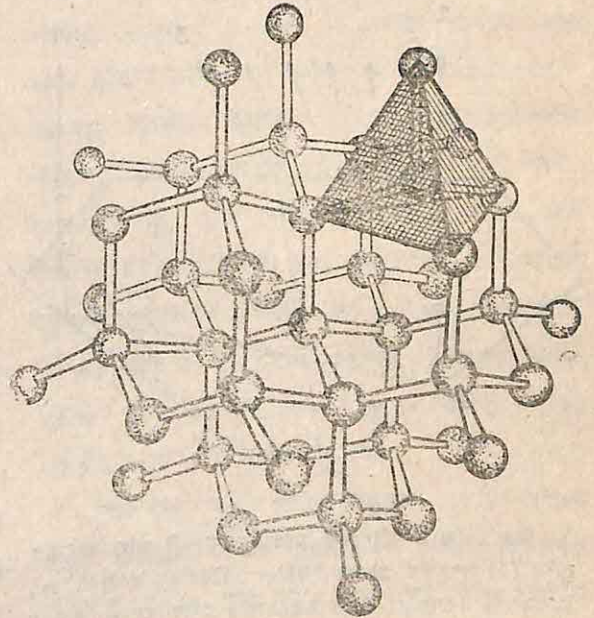
চিত্র ৯ (ক)। হীরের কাঠামো। গোলকগুলি হল কার্বন অনু।

এই বন্ধন খুবই দৃঢ়। এছাড়া পরমাণুগুলি ভিন্ন ভিন্ন তলে অবস্থিত। এককথায় বলা যায় হীরের মধ্যে কার্বন পরমাণুগুলি চতুস্তলক ভাবে সাজানো থাকে এবং প্রত্যেকটির মাঝখানে একটি কার্বন পরমাণু চতুস্তলকের চারকোণার চারটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। একটি হীরকখণ্ডে এইরকম অজস্র চতুস্তল জালের মত সাজানো থাকে। প্রতিটি চতুস্তল তার পাশেরটির সঙ্গে যুক্ত থেকে হীরকখণ্ডটিকে প্রচণ্ড শক্তি দেয়। আরও যত্ন করে হীরের গঠন লক্ষ্য করলে দেখবে এটি মোটেই ভিন্ন ভিন্ন চতুস্তলকের একত্র সমাহার নয়। প্রতিটি কার্বন পরমাণু তার কাছাকাছি অবস্থিত একাধিক চতুস্তলকের অংশ (কতগুলির তা কি গুণতে পারো?)। এই রকম বিচিত্র গঠনই হীরেকে কঠিনতম বস্তুগুলির অন্যতম করে তুলেছে।
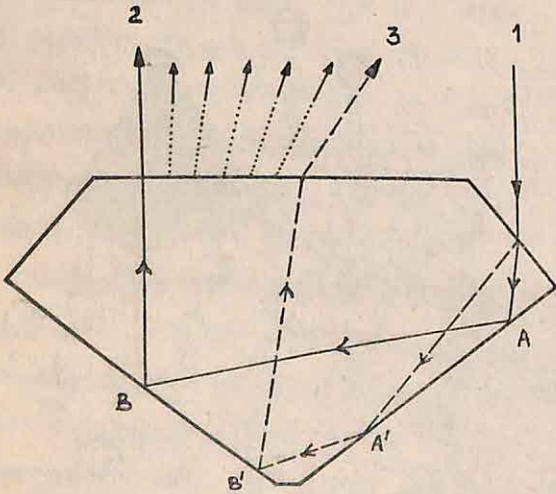
চিত্র ৯ (খ)। হীরকের মধ্যে প্রবেশকারী সাদা আলোক রশ্মি (1) সম্পূর্ণত অভ্যন্তরীণভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে A, A′, B এবং B′ বিন্দুতে। এটি ভঙ্গ হয়েও যাচ্ছে অনেক রং-এর রশ্মিতে (2 এবং 3)। এতে করেই হীরে নানান রং-এ ঝক্‌ঝক্ করছে।

তোমরা জানো হীরে অত্যন্ত মূল্যবান। তার কারণ হলো এটি দুর্লভ বস্তু। কার্বন পরমাণুগুলির এই বিচিত্র অবস্থান একমাত্র প্রচণ্ড চাপ এবং খুব উচ্চ তাপমাত্রার কারণে সম্ভব হয় বলেই হীরে দুর্লভ। পৃথিবীর ৪০০ কিমি অভ্যন্তরে এরকম পরিস্থিতি হতে পারে। তাই খুব গভীর খনির মধ্যে হীরে তৈরি হয়। এখন গবেষণাগারেও গ্রাফাইটের ওপর উচ্চ চাপ ও তাপ প্রয়োগ করে হীরে তৈরি করা যায়।

খনির মধ্যে যে হীরে পাওয়া যায় সেটি একটি শক্ত স্বচ্ছ বস্তু। গয়নার দোকানে তোমরা যে হীরে দেখতে পাও তার মত মোটেই উজ্জ্বল নয়। হীরেতে এই ঔজ্জ্বল্য আসে কি করে? মনে রেখো হীরের প্রতিসরণাঙ্ক খুব বেশি (সাধারণ কাঁচে যেখানে ১·৫ হীরেতে প্রায় ২·৪)। দক্ষ কারিগরেরা বিশেষ ধরণের যন্ত্র ব্যবহার করে প্রাকৃতিক হীরে এমনভাবে কাটে যাতে এর মধ্যে বহুতলের পাশগুলি বা পলগুলি থাকে (যাকে বলে পলকাটা)। এরকম একখণ্ড হীরের মধ্যে যখন আলো প্রবেশ করে সেটি বাইরে বার হয়ে আসার আগেই তার মধ্যে সামগ্রিকভাবে বহু আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে (চিত্রে AA′, BB′)। এই গুণগত কারণেই হীরের এমন ঔজ্জ্বল্য এবং আকর্ষণ।

এই সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ব্যাপারটি কি? একটি আলোকরশ্মি এইধরণের প্রতিফলনের মধ্যে দিয়ে তখনই যায় যখন এটি কোনো তলের ওপর পড়ে এমন কোণ সৃষ্টি করে যেটি ক্রিটিকাল কোণের থেকে বড়। এই ক্রিটিকাল কোণ (θ) নির্ভর করে মাধ্যমটির প্রতিসরণাঙ্কের (μ) ওপর। অর্থাৎ $\text{Sin}\ \theta = \frac{1}{\mu}$। যে বস্তুর প্রতিসরণাঙ্ক বেশি তার ক্রিটিকাল কোণ (θ) কমমাত্রিক। হীরের প্রতিসরণাঙ্ক ২·৪

বলে এর ক্রিটিকাল কোণ মাত্র ২৫ ডিগ্রী। (জলের প্রতিসরণাঙ্ক ১·৩ বলে তার ক্রিটিকাল কোণ প্রায় ৫০ ডিগ্রী)। হীরের প্রতিসরণাঙ্ক বেশি বলে হীরের মধ্যে যত আলোকরশ্মি প্রবেশ করে তার বেশির ভাগই যে কোনো একটি পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসার আগে একাধিক সামগ্রিক আভ্যন্তরীণ প্রতিফলন ঘটে। এইজন্যে হীরে এত ঝক্‌ঝকে এবং সুন্দর দেখতে।

হীরে অনেক কাজেও লাগে। হীরে কাঁচকাটার জন্যে ব্যবহার হয়, কাঁচ আর একটি কঠিন বস্তু। অতি উচ্চচাপ সৃষ্টির জন্যেও হীরে কাজে লাগে। দুটি হীরকখণ্ডকে একসঙ্গে খুব জোর দিয়ে চাপ দেওয়া যায়। সেই চাপে ভেঙ্গে যায় না। বিজ্ঞানীরা অন্য বস্তুতে উচ্চচাপ দিয়ে তার গুণগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় হীরের এই ক্ষমতা কাজে লাগান। কোনো কোনো ছেদকযন্ত্রের মুখে হীরে লাগানো থাকে। সেগুলি দিয়ে পাথর পর্যন্ত ফুটো করা যায়। এরকম কাজে ব্যবহৃত হীরেকে বাণিজ্যিক হীরে বলা হয়। এগুলির রঙ কালো।

১৫। কানা পর্যন্ত ভর্তি একটি কাঁচের পাত্রে একখণ্ড বরফ ভাসছে। বরফটি গলে গেলে কি পাত্রের জল উপচে পড়ে যাবে?

তোমরা জানো সমস্ত বস্তু উত্তপ্ত হলে বাড়ে এবং শীতল হলে হ্রাস পায়। কিন্তু বস্তুর ভর গরম বা ঠাণ্ডা যে কোনো অবস্থাতেই একই থাকে।

গলে যাওয়ার ব্যাপারটি দেখা যাক্। যখন কোনো জমাট বস্তু গলে যায় তখন জমাট অবস্থায় তার প্রাথমিক আয়তন যা থাকে তরল অবস্থায় সেই আয়তন সাধারণতঃ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু উভয় ক্ষেত্রেই ভর একই থাকে ফলে বোঝায় জমাট বস্তু তার তরল অবস্থার চাইতে বেশি ঘন (বেশি ভারি)। তোমরা শীতকালে ঠাণ্ডায় নিশ্চয়ই মাথায় দেওয়ার তেল জমে যেতে দেখেছো। তেলের একটা অংশ জমে যায় বলে জমাট অংশটি তেলের মধ্যে ডুবে থাকে। জল অবশ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম। জল যখন বরফ হয় তার আয়তন বেড়ে যায়। যেহেতু ভরের কোনো পরিবর্তন ঘটে না, একই ভরের ক্ষেত্রে যে বরফ বেশি স্থান দখল করে সেটি জলের থেকে হাল্‌কা অর্থাৎ কম ঘন হয়। ফলে বরফ জলের ওপর ভাসতে থাকে। যখনই তোমরা তরল পদার্থের ওপর কোনো বস্তু ভাসতে দেখবে তখনই জানবে বস্তুটির ঘনত্ব তরল পদার্থের থেকে কম।

ঘনত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয় এইভাবে, $\left(\frac{\text{ভর}}{\text{আয়তন}}\right)$।

জলের ঘনত্ব হলো ১ গ্রাম / সেমি^{৩}; অর্থাৎ ১ সেমি^{৩} জলের ওজন ১ গ্রাম। বরফের ঘনত্ব মাত্র ০·৯ গ্রাম / সেমি^{৩}। অর্থাৎ ১ সেমি × ১ সেমি মাপের একখণ্ড বরফের ওজন ০·৯ গ্রাম। এখন ভাসমান বস্তুর নিয়মটি স্মরণ করা যাক্। যখন কোনো বস্তু, ধরা যাক্ জলে ভাসে তখন সেই ডুবে থাকা অংশ যতটা জল সরায় তার ওজন পুরো বস্তুটির ওজনের সমান হয়। যেমন ১০ সেমি × ১০ সেমি × ১০ সেমি মাপের একখণ্ড কাঠ জলের মধ্যে ৫ সেমি ডুবে থাকবে যেহেতু কাঠের খণ্ডটির ঘনত্ব ০·৫ গ্রাম / সেমি^{৩}।

এখন ধর, কানা পর্যন্ত জলপূর্ণ একটি কাঁচের পাত্রে একখণ্ড বরফ ভাসছে। সোজা হিসেবের সুবিধার জন্যে ধরা যাক বরফটির মাপ ১ সেমি × ১ সেমি × ১ সেমি। বরফের ঘনত্ব ০·৯ গ্রাম / সেমি^{৩} বলে এর ওজন হবে ০·৯ গ্রাম এবং জলের

নিচে এটি ৯ মিমি ডুবে থাকবে বাকি ১ মিমি জলের ওপরে ভাসবে। সুতরাং বরফ খণ্ডের যে অংশ জলে ডুবে আছে সেটি যতটা জল অপসারণ করবে তার পরিমাণ দাঁড়াবে ১ সেমি × ১ সেমি × ০·৯ সেমি অর্থাৎ ০·৯ সেমি³।

বরফ খণ্ডটি যখন গলে যাবে এটি ০.৯ গ্রামে অর্থাৎ জলের ০·৯ সেমি³ যা নিমজ্জমান বরফ খণ্ডটির আয়তনের সমান তাতে পরিণত হবে। পুরো বরফ গলা জলটি অতএব ডুবে থাকা অংশের দ্বারা অধিকৃত জায়গাতেই ধরে যাবে (গলে যাওয়ার সময় বরফ খণ্ডটি ঐ ডুবে থাকা বরফের জায়গাটিতে মিশে যাবে)। এই প্রক্রিয়ায় স্বভাবতঃই কোনো বাড়তি জল স্থানচ্যুত হবে না এবং ফলে একফোঁটা জলও বাইরে উপচে পড়বে না।
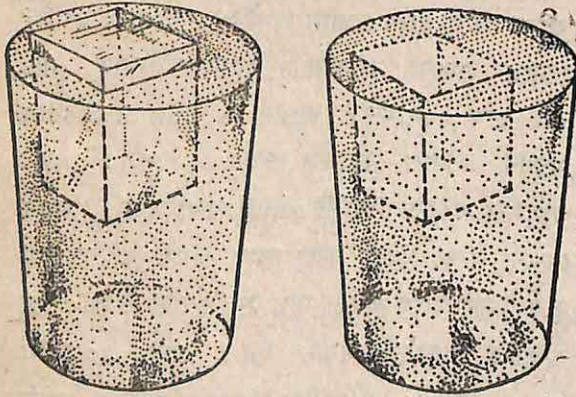
চিত্র ১০। বরফের টুকরো গলছে এবং এর নিমজ্জিত অংশের সমতুল গর্তে মিলিয়ে যাচ্ছে—একটি ফোঁটাও উপচে পড়ছে না।

১৬। $E=mc^2$ এই সূত্র অনুযায়ী শক্তি থেকে কি জড় পদার্থ সৃষ্টি সম্ভব?

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন শক্তি এবং জড় পদার্থের মধ্যে যে সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন তা হলো $E=mc^2$। এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের জগতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনে। এই সূত্রে E হলো শক্তি, m ভর এবং c আলোর গতি। আলোর গতিবেগ অনেক বেশি যেমন সেকেণ্ডে ৩ × ১০⁵ কিমি হওয়ায় এই সূত্র অনুসারে একটি ছোটো ভর সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হলে শক্তি উৎপাদন করবে। যেমন মাত্র ১ গ্রাম ভর বিশিষ্ট কোনো বস্তু সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হলে প্রায় ২ × ১০¹³ ক্যালোরির সমান শক্তি তৈরি হবে। এই শক্তি যদি জল গরম করার জন্যে আমরা ব্যবহার করি তবে এ দিয়ে ৬০ মি × ৬০ মি × ১০ মি ট্যাঙ্ক ভরতি জল গরম করে বাষ্পে পরিণত করা সম্ভব। এর থেকে তোমরা আঁচ করতে পারছো ছোটো এক খণ্ড বস্তু থেকে কি প্রকাণ্ড ব্যাপার ঘটা সম্ভব।

অবশ্য এই সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি না কেমন করে পদার্থকে শক্তিতে বা শক্তিকে পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়। শুধু এইটুকু জানতে পারি যে যদি আমরা এই রূপান্তরণ ঘটাতে পারি তবে তার ফলাফল $E=mc^2$ এই সূত্র অনুযায়ী হবে।

পদার্থ থেকে শক্তিতে রূপান্তরণের বহু উদাহরণ আছে। যখন একটি পরমাণুকে বিভাজন করা হয় তখন শক্তি উৎপন্ন হয়। এখানে পদার্থের একটি অংশ শক্তিতে পরিণত হয়। পরমাণু বিস্ফোরণের দ্বারা উদ্ভূত শক্তি, পারমাণবিক চুল্লী থেকে উদ্গত শক্তি, সূর্য থেকে বিকীর্ণ শক্তি—এই সবগুলিই পদার্থের এক অংশের শক্তিতে পরিণত হওয়ার উদাহরণ।

পারমাণবিক চুল্লীতে ইউরেনিয়াম পরমাণুর বিভাজন ঘটানো শক্তি উৎপাদনের একটি উপায়। $U^{২৩৫}$ এর একটি পরমাণুকে বিভিন্ন ভাবে বিভাজন করা যায়। তার একটি হলো, একে বেরিয়াম এবং

ক্রিপ্টন পরমাণুতে বিভাজন করা। একটি নিউট্রনের সাহায্যে এটি ঘটানো সম্ভব। একটি নিউট্রন যখন একটি $U^{২৩৫}$ পরমাণুকে আঘাত করে, নিউট্রন শোধিত হয়ে যায় এবং ইউরেনিয়াম পরমাণু বেরিয়াম এবং ক্রিপটন পরমাণুতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই বিভাজনের সময় প্রচুর পরিমাণ শক্তি উদ্গত হয়। সেই সঙ্গে নতুন নিউট্রনও বার হয়ে আসে। এই বেরিয়াম, ক্রিপটন এবং বহির্গত নিউট্রনের ভরের যোগফল ইরেনিয়াম পরমাণু এবং আপতিত নিউট্রনের ভরের যোগফলের চেয়ে কম। এই দুই ভরের মধ্যে পার্থক্য, ধরা যাক (Δm) অর্থাৎ মূল ভর থেকে উৎপাদিত ভরের পার্থক্য সূত্র $E=(\Delta m)c^2$ অনুযায়ী সম্পূর্ণভাবে শক্তিতে (E) রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

নিরবচ্ছিন্ন সৌরশক্তি তৈরির জন্যে যে প্রক্রিয়া দরকার তা বিভাজন প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। সূর্যের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ হাইড্রোজেন আছে। সূর্যের প্রচণ্ড তাপে চারটি হাইড্রোজেন পরমাণু (প্রোটন) একত্রিত হয়ে একটি হিলিয়াম পরমাণু গঠন করে। এই হিলিয়াম পরমাণুর ভর ঐ চারটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের যোগফলের চেয়ে কম। দুই ভরের এই পার্থক্য সৌরশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

সব উদাহরণগুলিতেই মূল ভরের একটি অংশমাত্র শক্তিতে পরিণত হচ্ছে। এমন একটি উদাহরণও অবশ্য দেখানো যায় যেখানে সমস্ত ভরটিই শক্তিতে পরিণত হবে। এই উদাহরণটি অবশ্য একেবারেই গবেষণাগারের পরীক্ষানিরীক্ষা থেকে নেওয়া। তোমরা জানো প্রত্যেকটি অণুর কেন্দ্রস্থ পরমাণু ঘিরে ইলেকট্রন থাকে। ইলেকট্রন হলো মৌলিক পদার্থকণিকা। বিজ্ঞানীরা এ যাবৎ তিরিশ থেকে চল্লিশ রকম মৌলিক পদার্থকনিকা আবিষ্কার করেছেন। ইলেকট্রন তাদেরই একটি। ইলেকট্রন ঋণাত্মক আধান বহন করে। মৌলিক পদার্থ কণিকাগুলির মধ্যে পজিট্রন আর একটি যা ঠিক ইলেকট্রনের মতই, শুধু তফাৎ হলো সেটি ধনাত্মক আধান বহন করে। ঠিক যেন ইলেকট্রনের যমজ ভাই। তোমরা জানো বিপরীত আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ফলে ইলেকট্রন ও একটি পজিট্রন পরস্পরের কাছাকাছি আসার চেষ্টা করে। পরস্পরের সংঘাত ঘটলে দুজনেই সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয় এবং দুটির ভরের যোগফলের সমমাত্রিক শক্তি গামারশ্মির আকারে বেরিয়ে আসে। (এর সঙ্গে অবশ্য ইলেকট্রন এবং পজিট্রনের গতিসঞ্জাত শক্তিও যোগ করতে হবে। তবে ভর থেকে উৎপন্ন শক্তির তুলনায় এই শক্তি নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর সে কারণে একে আমরা হিসেবের মধ্যে না-ও ধরতে পারি।) এই রূপান্তরণ $E_{\text{নির্গত}}$ = (ইলেকট্রনের ভর + পজিট্রনের ভর) C^2 এই সম্বন্ধ সূত্র অনুযায়ী ঘটে।

গবেষণাগারে আবার এর বিপরীত প্রক্রিয়াও লক্ষ্য করা যায়। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় গামারশ্মি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয় এবং সেই অবলুপ্তির বিন্দুতে একজোড়া ইলেকট্রন ও পজিট্রন বার হয়ে আসে। এই পদার্থকণিকাগুলি একটি শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় বিপরীত দিকে আকৃষ্ট হয়। সে কারণে ফটোগ্রাফিতে তাদের চলাফেরা খুব স্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। এখানে শক্তি পদার্থে রূপান্তরিত হচ্ছে (এবং পদার্থকণিকাগুলির গতিসঞ্জাত সামান্য পরিমাণ শক্তি কেবল থাকছে)। এই রূপান্তরণও $E=mc^2$ এই সূত্র ধরে ঘটছে।

মনে রেখো এই সূত্র থেকে কিন্তু আমরা শক্তিকে পদার্থে পরিণত করা বা তার বিপরীতটি ঘটানোর প্রক্রিয়া জানতে পারি না। আমাদের কাছে যদি

খানিকটা শক্তি মজুত থাকে এই সূত্র প্রয়োগ করে আমরা শুধু বলতে পারবো এর থেকে কতটা ভর উৎপন্ন হবে। কিন্তু উৎপন্ন বস্তুটি পেন্‌সিল, কি আম, কি কতকগুলি পদার্থ মাত্র তাও আমরা বলতে পারবো না।

১৭। আণবিক বোমা কি? এর বিস্ফোরণ হয় কি ভাবে?

৬ আগস্ট ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা শহরের উপর আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হলে দুনিয়া এর সম্পর্কে জানতে পারে। এর তিন দিন পরে, ৯ আগস্ট ১৯৪৫, নাগাসাকি শহরের ওপর আরেকটি বোমা ফাটে। এই দুটি বোমা জাপানের দুটি শহরকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দেয়, শত শত লোক মেরে ফেলে, ধ্বংস করে প্রচুর সম্পত্তি। জাপান আত্মসমর্পণ করে এবং যুদ্ধ শেষ হয়। হিরোশিমার ওপর নিক্ষিপ্ত বোমাটি ছিল ইউরেনিয়াম বোমা। আর নাগাসাকির ওপর ফেলা বোমাটিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল প্লুটোনিয়াম।

বিস্ফোরণ শব্দটি বিপুল পরিমাণে শক্তির সহসা নির্গমন বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হয়। আণবিক বিস্ফোরণে ঠিক তাই ঘটে। দেখা যাক ইউরেনিয়াম ২৩৫ (U^{235}) বা প্লুটোনিয়াম ২৩৯ (Pu^{239}) বোমা বিস্ফোরিত হলে কি ঘটে।

প্রকৃতিতে যে অবস্থায় পাওয়া যায় সেই স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে থাকে ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপের মিশ্রণ। মনে রেখো যে ইউরেনিয়ামের আইসোটোপগুলির (বা যেকোন পদার্থের আইসোটোপের ক্ষেত্রেই) একই রাসায়নিক ধর্ম বা গুণ রয়েছে। তাই আইসোটোপগুলিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এদের মধ্যে পার্থক্য কেবল আণবিক ওজনে। ইউরেনিয়ামের তিনটি আইসোটোপ হল U^{234}, U^{235} এবং U^{238}। এদের মধ্যে কেবল U^{235} বোমা বিস্ফোরণের সহায়ক। দুর্ভাগ্যবশত, ইউরেনিয়ামে U^{235}-এর শতকরা অংশ খুবই কম, মাত্র ০'৭ শতাংশ। তাছাড়া, ইউরেনিয়াম আইসোটোপে ভরের শতকরা পার্থক্যও খুবই কম—২৩৫ এর মধ্যে মাত্র ৩। প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামের বেশিরভাগটাই U^{238}, তাই তার থেকে U^{235} কে বিচ্ছিন্ন করাটা বেশ কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ। অবশ্য ইউরেনিয়াম বোমা বানাবার জন্য এই পৃথকীকরণ একান্ত প্রয়োজন। শতকরা ১০০ ভাগ বিশুদ্ধ U^{235} থাকার দরকার নেই। শতকরা ৯০ ভাগ U^{235} (বাকিটা U^{238}) হলেই বোমা বানানোর জন্য যথেষ্ট। দেখা যাক বিস্ফোরণ ঘটাবার জন্য U^{235} কিভাবে ব্যবহৃত হয়।

যখন কোন নিউট্রন U^{235}-এর নিউক্লিয়াসকে আঘাত করে তখন নিউট্রনটি শোষিত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই U^{235} নিউক্লিয়াসে এতটাই বিকৃতি ঘটে যে তা প্রায় সমান দুটি নিউক্লিয়াসে (যেমন, বেরিয়াম এবং ক্রিপ্টন) ভেঙ্গে যায়। এই প্রক্রিয়ায় সে ২ থেকে ৩ নিউট্রনও নির্গত করে। তোমরা জানো, এই সবকিছুর ভরের সমষ্টি U^{235} নিউক্লিয়াস ও একটি নিউট্রনের ভরের সমষ্টির কম। $E = mc^2$ সূত্র সম্পর্ক অনুসারে ভরের এই পার্থক্যই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়া যদি কেবল U^{235} এর একটি নিউক্লিয়াসের ওপর প্রয়োগ করা হয় তবে খুব সামান্যই শক্তি সৃষ্টি হবে। অবশ্য মোটের ওপর U^{235} সম্পন্ন ইউরেনিয়ামের একটি পিণ্ডের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে। ধরা যাক যে কোন একটি নিউক্লিয়াস বিদারণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেল। তোমরা জান যে বিদারণ তিনটি নিউট্রন সৃষ্টি

করবে। ইউরেনিয়াম পিণ্ডটি যদি বড় ধরনের হয় তবে U^{235} এর আরেকটি নিউক্লিয়াসকে আঘাত না করে এই তিনটি নিউট্রন বেরিয়ে আসবে এমন সম্ভাবনা খুব কম। বরং পিণ্ডটি বড় হলে প্রথম বিদারণে নির্গত তিনটি নিউট্রন খুবই সম্ভবত আরও তিনটি বিদারণ ঘটাবে যার মধ্য দিয়ে ৩×৩=৯ নিউট্রন নির্গত হবে। এই নয়টি নিউট্রন আরও নয়টি নিউক্লিয়াসকে বিচ্ছিন্ন করবে যার মধ্য দিয়ে নির্গত হবে ৯×৩=২৭ নিউট্রন। এই প্রক্রিয়া যদি চলতেই থাকে কোটি কোটি U^{235} নিউক্লিয়াস বিদারণ ঘটে যাবে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে, এবং নির্গত হবে বিপুল পরিমাণ শক্তি। এই ভাবেই আনবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটে।

অপরদিকে পিণ্ডটি যদি খুব ছোট হয় বিদারণে নির্গত বেশিরভাগ নিউট্রনগুলি আরও বিদারণ না-ঘটিয়েই বেরিয়ে যেতে পারে। ফলে তার প্রতিক্রিয়া অচিরেই মিলিয়ে যাবে। এরকম পিণ্ডের ভরকে বলা হয় সংকটের নিচে (বা অধঃ-সংকট=sub-critical). আর বৃহৎ পিণ্ডের ভরকে বলা হয় 'অধি-সংকট ভর' (super-critical mass)।

আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় কিভাবে? স্বভাবতই, জ্বালানির অধি-সংকট ভর নিয়ে কাজ শুরু করা যায় না। ফলে অধঃ-সংকট মাত্রার ভিন্ন ভিন্ন জ্বালানির পরিমাণকে রাসায়নিক বিস্ফোরক দিয়ে একটাকে আরেকটার মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে করে এক বিশাল অধি-সংকট ভর গঠিত হতে পারে। হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমাটিতে U^{235}-এর দুটি অধঃ-সংকট ভর ব্যবহৃত হয়েছিল।

নাগাসাকির ওপর নিক্ষিপ্ত প্লুটোনিয়াম বোমাটি কার্যকর হয়েছিল ভিন্ন নীতিতে যাকে বলা হয় অভ্যন্তরীণ চাপের নীতি। এই বোমাতে Pu^{239}-

চিত্র ১১ (ক) হিরোশিমা বোমা। দু'টুকরো ইউরেনিয়ামের একটা আরেকটার মধ্যে জ্বালিয়ে দেওয়া।
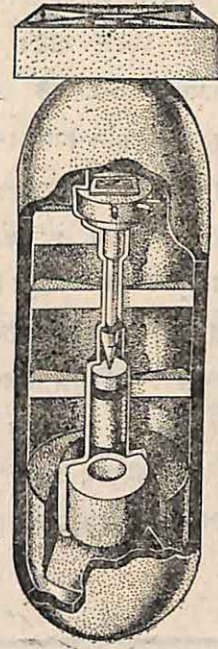
এর দুটি গোলার্ধ মুখোমুখি স্থাপন করে একটি সম্পূর্ণ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই গোলকের কেন্দ্রে একটি ছোট ফাঁপা জায়গা ছিল যেখানে বেরিলিয়াম এবং পোলোনিয়ামের ছোট ছোট ক্যাপসুল পৃথকভাবে রাখা ছিল। অভ্যন্তরীণ চাপের সময় এই পদার্থ দুটি মিশে গিয়ে প্রচুর নিউট্রন সৃষ্টি করে যা বিদারণ প্রক্রিয়া শুরু করে দেয়। প্ল্যাটিনাম নিউট্রনের উত্তম প্রতিফলক; Pu^{239}-এর দুটি গোলার্ধকে প্ল্যাটিনামের একটি ফাঁপা গোলকের মধ্যে ভরে রাখা হচ্ছিল। টি এন টি-র (TNT= ট্রাইনাইট্রোটোলিউইন) মত বিস্ফোরক ভর্তি করা ছিল এই প্ল্যাটিনাম গোলকের মধ্যে। লক্ষণীয় যে Pu^{239}-এর মোট ভর ছিল প্রায় ৫ কিগ্রা যা কার্যত এর সংকট-ভরের চেয়ে একটু কম। যাই হোক,

টি এন টি বিস্ফুরিত হলে প্লুটোনিয়ামের দুই গোলার্ধ একে অপরের চাপে ঠেসে যায়। প্লুটোনিয়ামের বর্ধিত ঘনত্ব তাকে অধি-সংকট স্তরে নিয়ে যায়। আর একই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ চাপ বেরিলিয়াম এবং পোলোনিয়াম ক্যাপসুল দুটিকে ভেঙে এই দুটি পদার্থকে মিশিয়ে দেয়, ফলে বিদারণ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মত নিউট্রনগুলি সৃষ্টি হয়। প্রচুর নিউট্রন সহযোগে প্লুটোনিয়াম তার সংকট পর্যায়ে অচিরেই পর্যায়ক্রমিক প্রতিক্রিয়া শুরু করে এবং বিপুল শক্তি নির্গত হয়।

U^{235} এবং Pu^{239} এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। প্লুটোনিয়াম প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। এটি পাওয়া যায় ইউরেনিয়াম ($U^{235}+U^{238}$)
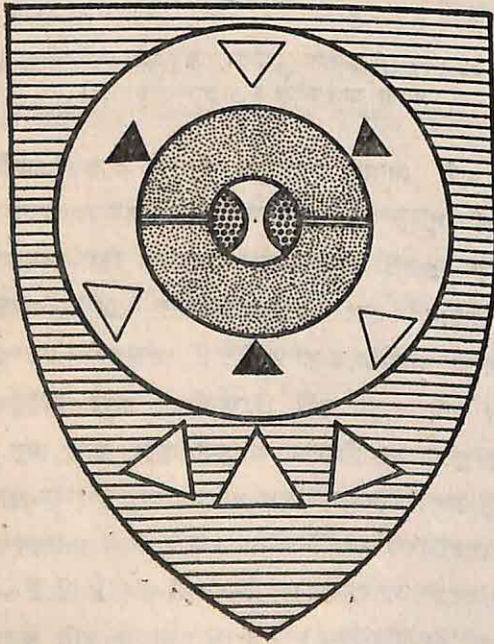
চিত্র ১১ (খ)। নাগাসাকি বোমা। একটি কেন্দ্রীয় গহ্বর ও পরিমণ্ডলীয় প্লাটিনাম গোলক সহ দুটি প্লুটোনিয়াম সংকট পর্যায়ে পৌঁছবার জন্য টি-এন-টির আঘাতে সংকুচিত প্লুটোনিয়াম গোলার্ধ।

নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটরের বর্জ্য-দ্রব্য হিসেবে। অর্থাৎ Pu^{239} হল মানুষের তৈরি জ্বালানি।

ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম বোমা হল বিদারণ বোমা। ১৯৪৫ সালে এই আবিষ্কারের পর থেকে বিজ্ঞানীরা নানা ধরণের আনবিক বোমা বানিয়েছেন, যেমন মিশ্রণ বোমা (হাইড্রোজেন বোমা), কোবাল্ট বোমা এবং নিউট্রন বোমা।

বিদারণ বোমা যে নীতিতে কার্যকর হয় নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটরও সেই নীতিতেই চলে। অবশ্য, বিদারণ-হার, এবং, ফলেই, শক্তি নির্গমনের হার নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটরে থাকে নিয়ন্ত্রণাধীন। ভারতে মহারাষ্ট্রের তারাপুরে এবং রাজস্থানের রাণাপ্রতাপসাগরে নিউক্লিয়ার রি-অ্যাকটর সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। তামিলনাড়ুর কল্পক্কমে আরেকটি রি-অ্যাকটর স্থাপিত হচ্ছে। নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ক্ষমতা ভারতবর্ষের আছে, যা কিনা বোঝা গেছে পোখারনের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে।

১৮। সমুদ্রের গভীরতা কি ভাবে মাপা যায়?

সমুদ্রের গভীরতা মাপার পুরোনো পদ্ধতিটি খুব সহজ ছিল। নোঙ্গরের মতন একটি ভারি জিনিসে দড়ির একপ্রান্ত বেঁধে সমুদ্রে ভাসমান জাহাজ থেকে সেটি জলে ফেলে দেওয়া হতো। দড়িটিতে দর্জির মাপার ফিতের মতো মাপের দাগ থাকতো। নোঙ্গরটি সমুদ্রের তলায় ঠেকে গেলে দড়িটি আর নামতো না। তখন দড়ির সেই মাপ সমুদ্রের গভীরতা নির্দেশ করত। পদ্ধতিটি খুবই সহজ। তবে অনেক বেশি গভীরতা মাপার জন্যে এটি কোনো কাজের নয়। সমদ্র অনেক জায়গাতেই খুব গভীর। কখনও বা ৬ কি.মি-র থেকেও বেশি।

সমুদ্র মাপার আধুনিক পদ্ধতিটি খুবই উদ্ভাবনী।

তোমাদের মনে পড়ে কত সময় আমরা সময়ের হিসেব দিয়ে দূরত্ব মাপি? যখন তোমরা বল বাড়ি থেকে তোমাদের স্কুল দশ মিনিটের পথ তখন কিন্তু আসলে বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব বোঝাও। তোমাদের হাঁটার গতি যে জানে সে বুঝতে পারবে এই দূরত্ব কতটা। সমুদ্রের জলের উপরিভাগ থেকে তলদেশ পর্য্যন্ত দূরত্ব মাপতেও এই একই নিয়ম কাজে লাগানো হয়। এখন এমন একজনকে দরকার যে ঠিক একই রকম সমান তালে এই দূরত্ব হেঁটে যেতে পারে। এই কাজে যাকে লাগানো হয় সে হলো ধ্বনি।

তোমরা জানো যে কোনো মাধ্যম দিয়ে ধ্বনি একই নির্দিষ্ট গতিতে যায়। বাতাসে ধ্বনির গতি প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৩৩০ মিটার, জলে সেকেণ্ডে ১৪৬০ মিটার। সমুদ্রের উপরিভাগে ধ্বনি সৃষ্টি করে আমরা দেখতে পারি কতক্ষণে সেটি সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছোয়। যেহেতু সমুদ্রের তলায় কেউ তা দেখার জন্যে নেই, ধ্বনি সমুদ্রের নিচে পৌঁছে তলদেশে ধাক্কা খেয়ে আবার ওপরে পৌঁছোতে কত সময় নেয়, সেটাই আমাদের হিসেব কষতে হবে।

এই কৌশলটি ঠিক কেমনভাবে কাজ দেয় সেটি একটি সহজ উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায়। কখনও পাহাড়ে গেছো? পরের বার যখন যাবে তখন একটা পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে জোরে চিৎকার করবে। তোমাদের চিৎকারের শব্দ পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলে তোমরা নিজেরাই সে শব্দ শুনতে পাবে। একে বলে প্রতিধ্বনি। চিৎকার করা এবং তার প্রতিধ্বনি আবারও শুনতে পাওয়ার মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান তা দিয়ে তোমাদের থেকে পাহাড়ের দূরত্ব কতখানি তা মাপা যায়।

জাহাজের তলায় একরকম যন্ত্র থাকে যার থেকে শব্দ বার হয়। ঐ শব্দ জলের মধ্যে দিয়ে চলে যায় এবং সমুদ্রের তলদেশে ধাক্কা খেয়ে আবার ফিরে আসে। এই ফিরে-আসা শব্দ জাহাজের তলায় আটকানো আর একটি যন্ত্রে ধরা পড়ে। শব্দ সমুদ্রের নিচে পৌঁছোতে এবং ফিরে আসতে যত সময় লাগছে তাকে শব্দের গতি দিয়ে গুণ করলে সমুদ্রের গভীরতার মাপের দ্বিগুণ পাওয়া যায়। (দ্বিগুণ কেন বলতে পারো?) এই সময়ের হিসেব একটী চার্টে আপনা থেকেই ধরা পড়ে। এইভাবে সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের গভীরতা অনায়াসে মাপা যায়।

সাধারণ ধ্বনি কিন্তু এ কাজে একেবারেই সহায়ক নয়। কেন তা দেখা যাক্। জাহাজের নিচে আটকানো যন্ত্র যে ধ্বনিতরঙ্গ তোলে তা জলের মধ্যে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে যায়; ফলে তাদের খুব কম অংশ সমুদ্রের নিচে পৌঁছোতে পারে। আবার সমুদ্রতল থেকে যে ধ্বনি প্রতিফলিত হয়ে আসে তা-ও একই ভাবে ছড়িয়ে পড়ার ফলে জাহাজে যে প্রতিধ্বনি ধরা পড়ে তা অত্যন্ত মৃদু। প্রশান্ত-মহাসাগরের মত গভীর সমুদ্রের ক্ষেত্রে এই প্রতিধ্বনি প্রায় ধরাই যায় না। সাধারণ ধ্বনি জলের মধ্যেও অনেকটাই মিলিয়ে যায়।

তাই ভিন্ন একধরণের ধ্বনি, যার নাম আলট্রাসনিক ধ্বনি, এই কাজে ব্যবহার করা হয়। আলট্রাসনিক ধ্বনি অতি দ্রুত স্পন্দন ক্ষমতা সম্পন্ন। যে ধ্বনি আমরা শুনতে পাই অর্থাৎ শ্রুতিগোচর ধ্বনির স্পন্দন গতি সেকেণ্ডে ২০ থেকে ২০,০০০ আবর্তন পর্য্যন্ত। আল্ট্রাসনিক ধ্বনি সেকেণ্ডে ২০,০০০ এরও বেশি আবর্তন সম্পন্ন। তাই এই ধ্বনি আমাদের শ্রুতির সীমায় ধরা

পড়ে না। আল্ট্রাসনিক ধ্বনি বিকীরণের পরিধি সাধারণ ধ্বনির চেয়ে কম বলে তার গৃহীত প্রতিধ্বনিও অনেক জোরোলো। এই ধ্বনি জলেও কম শোষিত হয়। এর ধ্বনি বেশিদূর ছড়িয়ে পড়ে না বলে সমুদ্রের তলদেশ ঠিকমত ধরা পড়ে। এই ধ্বনি একেকবারে সমুদ্রের তলদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পড়ে বলে প্রতিটি ছোটো খাটো উঁচু নিচুও ধরা পড়ে।

এই ধ্বনিটির সামনে যদি প্রকাণ্ড কোনো মাছ বা সাবমেরিনের মত বাধা এসে উপস্থিত হয় তাহলে কি হবে ভাবতে পারো? তবে কি সমুদ্রের গভীরতার সঠিক মাপ গোলমাল হয়ে যাবে? সৌভাগ্যক্রমে বিভিন্ন বস্তু বিভিন্ন ভাবে ধ্বনির প্রতিফলন ঘটায়। যে এ কাজে দক্ষ সে ঠিকই ধরতে পারে কোন্ ধ্বনি তিমি মাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে কোনটি বা সমুদ্রতলের। এই ধরণের ধ্বনি-পার্থক্য ধরতে পারার ক্ষমতা থাকে বলেই সে জলে ডোবা জাহাজ, মাছের ঝাঁক, তিমি মাছ—এদেরও অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে। ফলে এই পদ্ধতির কার্যকারিতা আরও বৃদ্ধি পায়।

জাহাজে লাগানো এই রকম আল্ট্রাসনিক ধ্বনি যন্ত্র—যা ছোটো ছোটো ধ্বনি তোলে এবং তার প্রতিধ্বনি রেকর্ড করে নেয়—সমুদ্রের গভীরতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মাপার জন্যে ব্যপকভাবে ব্যবহার করা হয়। জেনে রাখো, আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের গড় গভীরতা মাত্র ৪ কিলোমিটার। প্রশান্ত মহাসাগর কিন্তু খুবই গভীর। কোনো কোনো জায়গায় ১১ কিলোমিটারের চাইতেও গভীর।

১৯। ভূগর্ভে তেলের বৃহৎ সঞ্চয় কি ভাবে গড়ে ওঠে?

মরা গাছপালা প্রাণী ইত্যাদিতে পচন ধরে তার থেকে তেল তৈরি হয়। সামুদ্রিক প্রাণী এবং গাছগাছড়া মরে সমুদ্রের নিচে চলে গেলে তাতে এক ধরণের ব্যাক্টেরিয়া পচন ঘটায় এবং তেল উৎপন্ন করে।

এই তেলের ওপর পলি পড়ার মতো যখন নতুন করে গাদের স্তর জমে তখন পাথরের ছোটো ছিদ্র দিয়ে তেল ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যতই ক্রমাগত নতুন করে গাদ জমতে থাকে, সেই চাপে তেল মাটির আরও ভেতরে চলে যায় এবং সব ফাঁক ফোকর ভরতি করে নেয়। যতক্ষণ না তেল এমন নিশ্ছিদ্র পাথরে পেঁাছোয় যার মধ্যে দিয়ে আর যাওয়া যায় না ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলে। চাপ তার পরেও বাড়তে থাকলে এবার তেল ওপর দিকে উঠতে থাকে। যখন মাটি পর্যন্ত উঠে আসে তখন আমরা মাটির নিচের তেলের কথা জানতে পারি। কিন্তু মনে রেখো এই সমস্ত প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ সময় ধরে ঘটে আমরা এখন যে তেল ব্যবহার করছি কয়েক লক্ষ বছর আগে সেই তেল তৈরি হয়েছিল।

কোনো কোনো জায়গায় তেল ওপরের ভূত্বক্ পর্যন্ত উঠে আসতে পারে না। এই তেল পাশ বরাবরও ছড়িয়ে থাকে। এই অবস্থায় যদি সেটি দুই স্তর নিশ্ছিদ্র পাথরের মধ্যে আটকা পড়ে যায় তবে আর ওপরেও উঠতে পারে না। ফলে তেল ক্রমাগত চাপে ধীরে ধীরে পথ করে নেয় পাথরের যে কোনো বড় ফাটলের মধ্যে। সেখানেই এটি সঞ্চিত হতে থাকে।

আমরা জানি এবার আমাদের কিসের সন্ধান করতে হবে। আমরা অবশ্যই খুঁজবো ওপর নিচে নিশ্ছিদ্র শিলাপাথর আর মাঝখানে সছিদ্র শিলা এমন জায়গা। যদি মাঝখানের অংশটি বড় ধরণের

ফাঁপা হয় তবে তো আরো ভাল। কিন্তু কেমন করে জানা যাবে মাটির নিচে ঠিক এইরকম একটা অবস্থা রয়েছে কি না?

প্রথমে সছিদ্র প্রস্তরের নমুনা নিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখতে হয় তার মধ্যে জৈব পদার্থ কিছু আছে কিনা। পাথরে বেশি পরিমাণ জৈব পদার্থ পাওয়া গেলে তখন খনন কার্য সুরু হয়। মাটিতে ছোটো ছোটো গর্ত করা হয় তোমরা যেমন ছিপিতে গর্ত কর। তারপর বিভিন্ন গভীরতার পাথরের নমুনা পরীক্ষা করা হয়।

ওপরে বর্ণিত অবস্থা দেখা দিলে তেল পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

ভূত্বকে ছোটো ছোটো এবং নিয়ন্ত্রিত বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। বিস্ফোরণের ধাক্কার ঢেউ ভূত্বকের নিচে চলে গেলে নিচের গভীর পাথরে লেগে ফিরে আসে। কতখানি সময় এই যাওয়া আসায় লাগছে তা মাপা হয়। এই মাপ থেকেই জানা যায় অভ্যন্তরের এই পাথরের প্রকৃতি এবং বিস্তৃতি কিরকম। সেই সঙ্গে আরও জানা যায় কোথাও তেল জমা আছে কিনা। বিভিন্ন জায়গায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের পরিমাপও বলে দেয় তৈলখনি সন্ধান পাওয়ার সম্ভাবনা কতখানি। পৃথিবীর উপরিভাগের চৌম্বকক্ষেত্রের মানচিত্র তৈরি করেও তেল অনুসন্ধান সম্ভব।
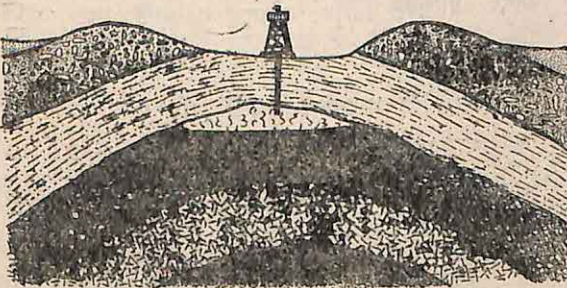
চিত্র ১২। কৃষ্ণবর্ণ শিলায় আবদ্ধ তেল (এবং, গ্যাস) ও তৎসহ সঞ্চয়-ভাণ্ডার এবং পাথরের ঢাকা।

তেলের সন্ধান পেলেই যে সেখানে প্রচুর জমা তেল পাওয়া যাবে এমন কথা নেই। তৈলকূপ খননের আগেই সেখানে সঞ্চিত তেলের পরিমাণের হিসেব কষে নেওয়া হয়। কখনও কখনও এই হিসেবে ভুল হয় এবং তখন খুব তাড়াতাড়ি কূপটি নিঃশেষ হয়ে যায়। সমুদ্রতীরের কাছাকাছি তেলের সন্ধান পাওয়া গেলে সমুদ্রের নিচেও তেল পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। আজকাল তেলের খোঁজে সমুদ্রের নিচে খনন কার্য চালানোও সম্ভব হয়েছে।

তোমরা শুনেছো বোধহয় গুজরাট প্রদেশে ভারুচ এবং ক্যাম্বের কাছে তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি বোম্বাইএর কাছে যথেষ্ট বড় তৈলাধারের সন্ধান মিলেছে।

২০। বিজলি কেন এবং কি ভাবে চমকায়?

এ প্রশ্ন আলোচনার আগে দেখা যাক্ বিজলি তৈরি হয় কি করে। বর্ষাকালে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত হয়। বিজলি চমকের সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত ঘটে। বিজলির ঝলক অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়। ক্ষণেকের জন্যে আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কোনো কোনো চমক আকাশের এক বড়অংশ জুড়ে একে বেঁকে যায়। আর বিশাল গর্জনে বজ্রপাতের সঙ্গে বিজলি পৃথিবীকে চমকে দেয়।

তোমরা জানো মেঘের মধ্যে অজস্র সংখ্যায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা থাকে। ধূলিকণার ওপরে জলীয় বাষ্প জমে এই জলকণাগুলি তৈরি হয়। কোনো কোনো মেঘ, বিশেষ করে বজ্রবাহী মেঘ আকারে বিরাট—প্রায় দুই থেকে তিন কিলোমিটার পর্য্যন্ত। তাদের উচ্চতাও অনেক। মাটি থেকে যে মেঘকে একটি নীল্‌চে কালো কার্পেটের মত দেখায় আসলে সেটি প্রায় দশ থেকে বারো কিলোমিটার

ব্যাপী একটি বৃহৎ পুঞ্জ। স্বাভাবিকভাবেই এই মেঘের চূড়ো যেখানে ঠেকে সেখানে এত ঠাণ্ডা যে সহজেই জল জমে তুষার বা বরফ হয়ে যায়।

বজ্রবাহী মেঘের মধ্যে খুব জোরালো বায়ু পরিচলন প্রবাহ সঞ্চালিত হতে থাকে। এই প্রবাহ জলকণাগুলিকে ওপরে বহন করে নিয়ে যায়। মেঘের একেবারে ওপরের অংশে পৌঁছোলে সেগুলি জমে বরফ কুচি হয়ে যায় এবং নিচে পড়তে থাকে। নিচে পড়ার সময় তারা বায়ুপ্রবাহ বাহিত আরও জলকণার সংস্পর্শে আসে। এই দুই রকম প্রবাহের সংঘর্ষে কণাগুলিতে বিদ্যুৎ আধান ঘটে। (এটি একটি মোটামুটি ধারণা মাত্র। সত্যি বলতে কি কেউই জানে না ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় মেঘের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।) যে বরফকুচিগুলি নিচে নেমে আসছিল সেগুলিতে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ (নেগেটিভ চার্জ) এবং যে জলকণাগুলি ওপরে উঠছিল সেগুলিতে ধনাত্মক বিদ্যুৎ (পসিটিভ চার্জ) আধান ঘটে। এই দ্বিবিধ আধানই অবশ্য পরিমাণে সমান। বায়ুর পরিচলন প্রবাহ গড়ে উঠতে থাকলে মেঘের শীর্ষদেশে একটি বৃহৎ ধনাত্মক বিদ্যুৎ আধান এবং তলদেশে অনুরূপ একটি সমপরিমাণ ঋণাত্মক আধান তৈরি হয়। দুটি কারণে এই বৃহৎ বিদ্যুৎ আধান তৈরি সম্ভব হয়। এক হলো মেঘের চারপাশের বায়ু অপরিবাহী বলে এই বিদ্যুৎ আধান কোনো ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না। তাছাড়াও মেঘটি উচ্চতায় বিশাল হওয়ার জন্যে এই জমে থাকা দুই বিপরীত আধান পরস্পর থেকে বহু কিলোমিটার ব্যবধান দ্বারা বিচ্ছিন্ন থাকে।

তাহলে বিজলি চমকায় কি করে? মনে রেখো যখন আমরা উত্তম তাপ পরিবাহী বা অপরিবাহী ধরণের শব্দ ব্যবহার করি সেটি আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়। তামার তারের মত খুব ভাল তাপ পরিবাহীও বিদ্যুৎ প্রবাহে কিছুটা প্রতিরোধ সৃষ্টি করে। (এই কারণে এটি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।) ঠিক তেমনি যে কোনো অপরিবাহী একটি নির্দ্দিষ্ট ভোল্টেজ পর্যন্ত ঠিকমত কাজ করে। মেঘের চারপাশে যে বাতাস থাকে তা নিঃসন্দেহে ভালরকম অপরিবাহী। তবে কখনও কখনও মেঘের মধ্যে নিহিত ভোল্টেজ পার্থক্য (মাটির তুলনায়) এত বেড়ে যায় যে তা এক কোটি (অর্থাৎ $১০^৭$) ভোল্ট পর্য্যন্ত উঠে যেতে পারে। তখন বাতাসের প্রতিরোধ ভেঙ্গে যায়, আকাশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বিজলি ঝলসে ওঠে এবং প্রচুর বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকে। এই বিদ্যুৎ কোন্ দিক ধরে প্রবাহিত হবে? কখনও এই বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ মেঘের মধ্যেই ঘটে, কখনও দুটি মেঘের মধ্যে ঘটে কখনও বা মেঘ এবং পৃথিবীর মধ্যে ঘটে। মাটির দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় কি করে?

মাটির দিকে বিদ্যুৎ বয়ে যায় একটিই বড় কারণে। মেঘের তলদেশে যে ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আধান থাকে তা নিচের মাটিতে ধনাত্মক (বিপরীত) বিদ্যুৎ আবেশ তৈরি করে। তোমরা জানো বিপরীতধর্মী আধান পরস্পরকে আকর্ষণ করে। বিদ্যুৎ প্রবাহ যখন পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয় এই আকর্ষণ বাড়ে এবং আবিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহে আকৃষ্ট হতে থাকে। দুটি প্রবাহ মিলে গেলে মেঘের থেকে মাটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ পৌঁছে যাওয়ার একটি পরিষ্কার পথ তৈরি হয়ে যায়। এই প্রবাহের গতি অত্যন্ত দ্রুত। এটি মাত্র এক সেকেণ্ডের একটি সামান্য ভগ্নাংশ সময় স্থায়ী হয়।

এই অল্পসময়ের মধ্যে এত বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চালিত হলে বিজলি চমকের প্রতিক্রিয়া হয়, উজ্জ্বল স্ফলিঙ্গ এবং সাথে বজ্রনির্ঘোষ। বিদ্যুৎ

প্রবাহের পথের বাতাসের পরমাণুগুলি এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে তাদের থেকে আলো বিকীর্ণ হয় এবং একটি উজ্জ্বল পথরেখার সৃষ্টি হয়। তোমরা জানো কোনো কিছুতে কম্পন ঘটলে তবেই শব্দের উৎপত্তি হয়। বিজলির পথরেখার মধ্যের বাতাস হঠাৎ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সেটি তৎক্ষণাৎ সম্প্রসারিত হয়। এই হঠাৎ সম্প্রসারণের অভিঘাত (চাপ) তরঙ্গের সৃষ্টি করে। বাতাস সম্প্রসারণের দ্বারা যে শূন্য স্থান তৈরি হয় সেটি পূর্ণ করতে বিদ্যুৎ প্রবাহের চারধারের বাতাস সেখানে ছুটে আসতে থাকে। বাতাসের এই হঠাৎ চলাচলজনিত কম্পন তোমরা যে মেঘ গর্জন শোন সেই শব্দ উৎপন্ন করে।

তোমরা অবাক হতে পারো এই মেঘ গর্জন একবারে সজোরে না হয়ে বেশ একটু সময় ধরে টানা শোনা যায় কেন? আকাশে যে আরও মেঘ থাকে শব্দ তরঙ্গ তাতে প্রতিধ্বনিত হয়। এই শব্দ তরঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যে তরঙ্গটি সোজাসুজি আমাদের কাছে পৌঁছোয় তার থেকেই প্রথম জোর মেঘের আওয়াজটি আমরা শুনতে পাই। ক্রমে অন্য মেঘে প্রতিধ্বনিত শব্দতরঙ্গগুলি আমাদের কাছে পৌঁছোতে থাকে। এগুলি মূল শব্দের প্রতিধ্বনি। স্বাভাবিকভাবেই সব প্রতিধ্বনি একসঙ্গে শোনা যায় না। দূরের মেঘের চাইতে কাছের মেঘের শব্দ আমাদের কাছে আগে এসে পৌঁছোয়। এই কারণে বেশ একটু সময় ধরে আমরা মেঘগর্জন শুনতে পাই।

বিজলি পৃথিবীকে আঘাত করলে কি ঘটে? তোমরা পড়েছো নিশ্চয়ই গ্রামে বাড়ি ঘর গাছপালা বাজ পড়ে পুড়ে যায়। মনে রেখো লক্ষ লক্ষ ভোল্টেজ একসঙ্গে সংহত হলে তবেই বজ্রপাত হয়। একটি সাধারণ বিজলি চমকেও ৩০,০০০ অ্যাম্পিয়ার বিদ্যুৎ থাকে। এযে কি প্রকাণ্ড শক্তি তা বুঝবে যদি মনে করে দেখো আমাদের বাড়ির বৈদ্যুতিক তার ২৩০ ভোল্টে মাত্র দু'এক অ্যামপিয়ার বিদ্যুৎ বাহিত হয়। তা সত্ত্বেও শর্ট সার্কিট ঘটলে বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ দেখা দেয় এবং অনেক ক্ষতিও ঘটে যায়। এই একই ব্যাপার প্রকৃতিতে অনেক বৃহৎ আকারে ঘটে।

আজকাল সম্ভাব্য বজ্রপাত থেকে ঘরবাড়ি রক্ষা করার একটি সহজ উপায় বার হয়েছে। তোমরা বড় বড় বাড়িতে কারখানায় সূচালো বর্শা লাগানো তামার রড দেখে থাকবে। এই রড মাটির সঙ্গে খুব চওড়া এবং পুরু তামার তার দিয়ে আটকানো থাকে। বাজ পড়লে এই রড এবং তামার তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ কোথাও কোনো ক্ষতি না ঘটিয়ে মাটির নিচে চলে যেতে পারে এবং বাড়িটিও রক্ষা পায়।

২১। পৃথিবীতে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় কি ভাবে?

খনিজ সাধারণত পাওয়া যায় গভীর খনিতে, অর্থাৎ ভূত্বকের গভীরে। প্রাচীন লোকেরা কি করে জানত যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গভীর করে খুঁড়তে হবে কোন ধাতু, ধরা যাক, নিকেল পাওয়ার জন্য? স্বভাবতই প্রাচীন লোকেরা এই লুক্কায়িত সম্পদ সম্পর্কে কিছুই জানত না।

তবে, তারা অচিরেই সেই সব খনিজের ব্যবহার শিখেছিল যেগুলি সহজেই পাওয়া যেত অনাবৃত মাটি আর পাথরের বুকে। যেমন, মানুষ লৌহ-সমৃদ্ধ পাথরের ব্যবহার শিখেছিল, আর তাই দেখা দিয়েছিল লৌহযুগ। একইভাবে, ইংল্যাণ্ডে নিউকাস্‌লের কাছে পাহাড়ে পাওয়া গিয়েছিল

সঞ্চিত কয়লা। সোনাও আবিষ্কৃত হয়েছিল এইভাবেই কতগুলি নদীর অগভীর জলে। এই সঞ্চয় অবশ্য অচিরেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, শিল্পবৃদ্ধির সাথে সাথে নানাবিধ খনিজের প্রয়োজন মানুষের কাছে বেড়ে গিয়েছিল। সে দ্রুত আবিষ্কার করেছিল মাটির তলার গোপন সম্পদ।

যে কোন খনিজের উৎস সন্ধানে মানুষ কিভাবে ঘুরে বেড়ায়? পদ্ধতিটি নির্ভর করে খনিজের ধর্মের ওপর। যেমন, ধরা যাক আমরা লোহার খনি খুঁজছি। আমরা জানি যে লৌহ-অক্সাইড (Fe_3O_4) চৌম্বক ধর্ম সম্পন্ন। কোন পাথরে যদি বেশি পরিমাণে লৌহ বা নিকেলের চৌম্বক আকর থাকে তবে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সেই জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে বিচ্যুতি দেখাবে। আমরা যদি লোহা খুঁজি তবে সম্ভাব্য ক্ষেত্রের কাছাকাছি চৌম্বক ক্ষেত্রের বিচ্যুতি দেখে নেব।

উপরে বর্ণিত সূত্রটি বহুক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেমন, তোমরা জানো পৃথিবী সব কিছুর ওপরই তার মাধ্যাকর্ষণ প্রয়োগ করে। পৃথিবী যদি সমপ্রকৃতির (অর্থাৎ সর্বত্র একই রকম) এবং সম্পূর্ণ গোলক হতো তবে তার আকর্ষণও সর্বত্রই সমান হতো। যাই হোক, পৃথিবী অতটা নিখুঁত নয়। কিছু কিছু জায়গায় ভূত্বক পুরু, কোথাও বা পাতলা। কোন কোন স্থানে ভূত্বকে থাকে খুব ভারি (ঘন) ধাতব শিলা, আবার কোথাও থাকে সছিদ্র বেলে পাথর। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সম্পর্কে বিস্তারিত চর্চায় পাওয়া যায় খনিজ সম্পদের সম্ভাব্য অবস্থানের কার্যকরী ইঙ্গিত।

আণবিক শক্তি ও পারমানবিক রি-অ্যাক্টর আসার সাথে সাথে আমাদের তেজস্ক্রিয় খনিজের প্রয়োজন বেড়ে গেছে। তোমরা জানই যে তেজস্ক্রিয় বস্তু রশ্মি বিকিরণ করে। তেজস্ক্রিয় খনিজ যদি খুঁজে বার করতে চাও তবে এই রশ্মি খোঁজার বিশেষ যন্ত্র সঙ্গে নাও। তেজস্ক্রিয় খনিজ বার করার জন্য আরও একটি সূত্র আছে। এই খনিজগুলি তাপ বিকিরণ করে অর্থাৎ শক্তি ছড়ায়। চারপাশের বস্তু সমূহ যখন এই তাপ বা শক্তি শুষে নেয় তখন সেই এলাকার তাপমাত্রা বেড়ে যায়। যদি তোমরা ভূত্বকে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা এলাকার ঘেরাটোপে উষ্ণ অঞ্চল খোঁজ তবে তোমাদের তেজস্ক্রিয় খনিজ ভাণ্ডার আবিষ্কারের সম্ভাবনা থাকবে।

বিভিন্ন বস্তুর যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম বা গুণ রয়েছে তা নানান ভাবে বোঝা যায়। যেমন, তোমরা জান যে ভূমিকম্প বা বিস্ফোরণের সময় অভিঘাত তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গগুলি বিভিন্ন শিলার মধ্য দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে প্রবাহিত হয়। এই তরঙ্গগুলি কিভাবে বিভিন্ন স্তরের এবং ভূত্বকের অংশ বিশেষের মধ্য দিয়ে যায় তার ভালভাবে চর্চা ধাতব শিলার (যে শিলার মধ্যে ধাতু থাকে) উপস্থিতি আবিষ্কারে খুবই সহায়ক।

এই আলোচনার থেকে বোঝা যায় যে আমরা যদি ধাতুর বর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে চাই তবে আমাদের ভূত্বক সম্পর্কে চর্চায় যত্ন নিতে হবে। ভারতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, মিনারেল এক্সপ্লোরেশন কর্পোরেশন এবং আণবিক শক্তি বিভাগের আণবিক খনিজ দপ্তর ও কতকগুলি ভূবিদ্যা বিভাগ এই কাজ করছে। চৌম্বক ক্ষেত্র, স্থানীয় তাপমাত্রা, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি দেখানো আছে এমন সযত্নে রচিত মানচিত্র পাওয়া যায়। এই চার্টগুলি আমাদের লৌহ আকর, ম্যাংগানিজ ও অন্যান্য ধাতুর সঞ্চিত ভাণ্ডার আবিষ্কারে সাহায্য

করেছে। তোমরা হয়ত শুনেছ যে তেজষ্ক্রিয়তার সন্ধান প্রায়ই ইউরেনিয়াম ও অন্যান্য তেজস্ক্রিয় খনিজের উৎস উন্মুক্ত করে।

এই অনুসন্ধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হল স্যাটেলাইট বা কৃত্রিম উপগ্রহ। উপগ্রহটি পৃথিবীর উপরিতলের এক বড় অংশের নমুনা পরীক্ষার সুযোগ পায় এবং সেই তথ্য পাঠাতে পারে যা কমপিউটারের সাহায্যে দ্রুত বিশ্লেষণ করা যায়। বস্তুতঃ, একটি মার্কিন উপগ্রহের নামই হল ERTS (Earth Resource Technology Satellite) বা পৃথিবীর সম্পদ সমীক্ষা উপগ্রহ। ভারতে এরকম উপগ্রহ তৈরির কাজ শুরু হয়েছে এবং উপগ্রহ প্রেরিত তথ্যের দূরাগত নিরীক্ষার কাজও অনেকটা এগিয়েছে।

এই ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ছাড়াও হঠাৎ কিছু খনিজ সম্পদও আবিষ্কার হয়েছে। যেমন, একদম ভিন্ন কাজে খোঁড়াখুঁড়ি চালাতে গিয়ে (ধরা যাক, কূপখনন) কোনও খনিজের প্রচুর সঞ্চয় ধরা পড়ে। সেক্ষেত্রে সযত্ন অনুসন্ধান চালানো হয় মজুতের পরিমাণ কতটা তা জানতে। যদি দেখা যায় মজুত যথেষ্ট পরিমাণ খননকার্য চালানো হয়। অন্যথায় তা হয় পরিত্যক্ত।

২২। সমুদ্র কি ভাবে তৈরি হয়েছে?

ভূপৃষ্ঠের চারভাগের প্রায় তিনভাগই সমুদ্রে ঘেরা। যার ওপর আমরা বসবাস করি সেই বাকি অংশটি ডাঙ্গা। পৃথিবীকে ঘিরে একটি ঘন বায়ুমণ্ডল আছে যার প্রধান উপাদান নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন। বায়ুমণ্ডলের বাকি অংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প, আরগণ ইত্যাদিতে তৈরি। আমাদের এমন বিশ্বাসের একটি প্রবণতা হতে পারে যে পৃথিবী সুরু থেকে এরকমই দেখতে ছিল।

এই ধারণা অবশ্য সত্য নয়। প্রায় চার পাঁচ লক্ষ কোটি বছর আগে প্রচণ্ড উত্তপ্ত অবস্থায় পৃথিবীর জন্ম। এই প্রচণ্ড তাপে পৃথিবীর চারপাশে যে গ্যাসের আবরণই থেকে থাকনা কেন সেটি দ্রুত বিলুপ্ত হয়ে যায়। পৃথিবী অল্পকাল মধ্যেই বায়ুমণ্ডল শূন্য অবস্থায় পৌঁছোয়।

তবে পৃথিবী যখন ধীরে ধীরে শীতল হলো তার ওপরে শক্ত পাথরের স্তর জমলো। পাথর জমে শক্ত হওয়ার সময় তাদের মধ্যে আটকে থাকা নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস মুক্ত হলো। পৃথিবীর বেশির ভাগ পাহাড় পর্ব্বতই তখন জীবন্ত আগ্নেয়গিরি হয়ে প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতো। এই অগ্ন্যুৎপাতের সময়েও নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প নির্গত হতো। এইভাবে পৃথিবী নিজেই নিজের বায়ুমণ্ডল তৈরি করে নিল। পৃথিবী অনেক ঠাণ্ডা হয়ে আসার দরুণ এই নতুন বায়ুমণ্ডল বিলুপ্ত হলো না এবং বেশির ভাগই থেকে গেল।

পৃথিবী যখন আরও ঠাণ্ডা হলো বায়ুমণ্ডলের জলীয় বাষ্প জলে পরিণত হলো। অর্থাৎ বৃষ্টি হয়ে পড়তে লাগলো। আমাদের বর্ষার বৃষ্টি নয়, এই বৃষ্টি কয়েকহাজার বছর ধরে ঝরে চললো। বৃষ্টির জল নিচু জায়গায় জমে সমুদ্র তৈরি হলো।

তোমরা অবাক হচ্ছো এই ভেবে যে এত পুরোনো ঘটনার কথা আমরা জানলাম কি করে? এর সবটিই আসলে অনুমান। আর এই অনুমান আমাদের বর্তমানে জানা তথ্যের ভিত্তিতে। যেমন এখনও অগ্ন্যুৎপাতের সময় নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প নির্গত হয়। এই রকম পর্য্যবেক্ষণের সাহায্যে আমাদের অনুমানগুলি আরও দৃঢ় হয়।

বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন কোথা থেকে এলো জানো? গোড়ায় কিন্তু অক্সিজেন ছিল না। এর খানিক অংশ

এসেছে সমুদ্রের জলে প্রচুর আলট্রাভায়োলেট আলোক সম্পন্ন তখনকার দিনের সূর্য্যরশ্মির প্রতিক্রিয়া থেকে (ধর ৩·৫ থেকে ৪ লক্ষ কোটি বছর আগে)। বেশিরভাগ অক্সিজেন পেয়েছি আমরা গাছপালা থেকে। তোমরা জানো আলোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়া কালে গাছেরা কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নিয়ে বাতাসে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়।

২৩। ঝড়ের কারণ কি ?

গরমের দিনে মৃদু বাতাস ভারি ভালো লাগে। বাতাস খুব জোরে বইলে অবশ্য অনেক ক্ষতি ঘটাতে পারে। কখনও বা বাতাস বৃত্তাকার গতিতে বইতে থাকে। বাতাস এইভাবে পাক খেয়ে বৃত্তাকারে ঘুরলে আর প্রচণ্ড বেগে বইলে তাকে বলে সাইক্লোন। সাইক্লোন বিধ্বংসী হতে পারে।

কোনো এক স্থানের বাতাসের চাপ অন্য জায়গায় বাতাসের চাপের চেয়ে কমে গেলে বাতাস উচ্চচাপ এলাকা থেকে নিম্নচাপ এলাকার দিকে বয়ে যেতে সুরু করে। গরমকালে যখন সমুদ্রের থেকে মাটি বেশি গরম হয়ে ওঠে তখনই সাধারণতঃ এরকম অবস্থার সৃষ্টি হয়। গরম মাটির ওপরের বাতাস উত্তপ্ত হয় এবং ওপরে উঠে যেতে থাকে। তারফলে সেখানে একটি নিম্নচাপ এলাকার সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের ওপরকার অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাস ঐ জায়গায় ছুটে আসতে থাকে। তোমরা জানো সমুদ্রের ওপরের বাতাস অনেক সময়েই বৃষ্টিবাহী মেঘ বয়ে নিয়ে আসে। যেমন মৌসুমী বাতাস বৃষ্টি বয়ে আনে।

মনে রেখো সমুদ্রের ওপরের বাতাস সর্বত্র একইরকম ভাবে উত্তপ্ত বা শীতল থাকে না। তাই সমুদ্রের ওপরের বাতাসও উচ্চচাপ এলাকা থেকে নিম্নচাপ এলাকার দিকে যাতায়াত করে। তেমনি মাটির ওপরেও এরকম বাতাস থাকে। সেই বাতাস সাধারণত ধূলিঝড় সৃষ্টি করে। উত্তর ভারতে বিশেষতঃ রাজস্থান এবং গুজরাটের কিছু অংশে এবং দিল্লীতে গরমের সময় বেশ ঘনঘন এই ধূলিঝড় ওঠে।

নিম্নচাপ এলাকা থেকে যাওয়ার সময় বাতাস তার দিক পরিবর্তন করে। প্রায় নিয়ম হিসেবেই ঝড় সমুদ্রের ওপরেই প্রথম হয়, তারপর সেটি মাটির দিকে প্রবাহিত হয়। এই কারণে সমুদ্র তীরবর্তী লোকদের বেশি ঝড়ঝঞ্ঝা সইতে হয়। সমুদ্রের থেকে অনেকদূরের জায়গায় এই ঝড় খুব কমই পৌঁছোয়।

আসল ব্যাপারটি হলো বাতাসের গতি। বিকেলে সামুদ্রিক বাতাস ঘন্টায় মাত্র ২০ থেকে ৩০ কি. মি বা তারও কম গতিতে বইতে থাকে। এই বাতাস বেশ লাগে। বাতাসের গতি ঘন্টায় ৫০ থেকে ৬০ কি. মি হয়ে গেলে তখনই এর বিধ্বংসী ক্ষমতার দিকটি নজরে আসে। সচরাচর ঝড়ের সময় বাতাস বয় ঘন্টায় ৮০ থেকে ১০০ কিমি গতিতে। এই বাতাস গাছ উপড়ে ফেলতে পারে, বাড়ির চাল উড়িয়ে নিয়ে যায়, সমুদ্রে বিশাল বিশাল ঢেউ ওঠায় এবং ছোটো জাহাজ ও নৌকো ডুবিয়ে দিতে পারে।

সাইক্লোন এর চেয়েও মারাত্মক। যখন একাধিক উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ এলাকা তৈরি হয় তখন ক্রান্তিয় অঞ্চলে সাইক্লোনের উৎপত্তি ঘটে। বিপরীত মুখী তীব্র বায়ু একত্র হয়ে একটি বৃত্তাকার বায়ুপ্রবাহ গড়ে তোলে। তাকে বলে সাইক্লোন। প্রায়ই এই বাতাস প্রকাণ্ড বৃত্তপথে ঘন্টায় ২০০ কিমি বেগে ধাবিত হয়। সমুদ্রতীরে পৌঁছোলে এটি প্রভূত ক্ষতিসাধনকরে। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশে এরকম ঘটেছে; কখনও বা বৃষ্টিবাহী মেঘ সাইক্লোনের মধ্যে আট্‌কা পড়ে যায়। তখন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত এবং বজ্রপাত ঘটতে থাকে।

মাটির ওপরেই সাইক্লোন তৈরি হয়। কখনও বা

বজ্রবাহী ঝড় মেঘের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সাইক্লোন তৈরি করে। মাটিতে নামার সময় এটি বৃষ্টি নিয়ে নামে। এই সাইক্লোন ছোটো আকারের এবং স্বল্পস্থায়ী হলেও যতক্ষণ সাইক্লোন থাকে বাতাস প্রচণ্ড গতিবেগে বইতে থাকে (ধর ঘন্টায় ২০০ কিমি)। অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকায় এই ধরণের সাইক্লোন ঘটতে দেখা যায়।

সাইক্লোন সম্বন্ধে অনেককিছুই এখন আমরা জানতে পেরেছি। কৃত্রিম উপগ্রহ—যাকে আবহাওয়া উপগ্রহ বলা হয়—আমাদের আগেভাগেই নিখুঁতভাবে জানিয়ে দেয় ঠিক কোথায় নিম্নচাপ ঘটেছে। এই এলাকার অবস্থান এবং যে গতিতে সেটি এগিয়ে চলেছে সেই তথ্য থেকে আমরা বলে দিতে পারি কখন এবং কোথায় এই সাইক্লোন আছড়ে পড়বে। একে রোধ করতে না পারলেও এই সব তথ্য কাজে লাগিয়ে আমরা ধনসম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারি। সবচেয়ে বড় কথা অনেক মূল্যবান জীবনও রক্ষা পায়।

২৪। উদীয়মান বা অস্তগামী সূর্যকে উপবৃত্তাকার দেখায় কেন?

পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল থাকার কারণে অনেক মজার জিনিস ঘটে। সূর্য ওঠার সময় যে তাকে দেখায় ঝক্‌ঝকে কমলারঙা, আকাশ লাগে ঘননীল, রাতে ঝিক্‌মিক্ করে তারা, উত্তপ্ত মরুতে মরীচিকা জাগে—এসবই বায়ুমণ্ডলের কারণে। দিগন্তরেখায় যে সূর্যকে উপবৃত্তাকার দেখায় সেও এই একই কারণে।

তোমরা জানো আলোর গতি সরলরেখায়। আরও জানো একটি আলোক রশ্মি এক মাধ্যম (বস্তু) থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করার সময় বেঁকে যায়। এই ঘটনাকে বলে আলোর প্রতিসরণ। এই প্রতিসরণের কারণে এক গ্লাস জলে একটি পেন্‌সিল ডুবিয়ে রাখলে সেটি ভেঙ্গে গেছে বলে মনে হয়। প্রতিসরণ সম্বন্ধে আরও দুটি কথা খেয়াল কর। দুটি মাধ্যমের ঘনত্বে যত বেশি পার্থক্য আলোও তত বেঁকে যায়। দ্বিতীয়তঃ কোনো মাধ্যমের ওপর লম্বভাবে আপতিত আলোকরশ্মি বেঁকে যায় না। আপতন কোণ যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, আলোকরশ্মিও তত বেঁকে যেতে থাকে।

পৃথিবীকে ঘিরে পুরু বাতাসের যে আস্তরণ আছে তাকে বায়ুমণ্ডল বলা হয়। মাটির কাছাকাছি বায়ুমণ্ডল খুব ঘন। কিন্তু যত ওপরে উঠবে ততই তা হাল্‌কা হয়ে যায়। সূর্যরশ্মি শূন্যে অনেক পথ পার হয়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার সময় আলোক-রশ্মি পথ পরিবর্তিত হয়। মনে রেখো আলোক-রশ্মি প্রথমে পাতলা বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে আসে এবং আলো যত পৃথিবীর দিকে যেতে থাকে এই বায়ুমণ্ডল তত ঘন হয়। অবশেষে এই আলোক-রশ্মি আমাদের চোখে প্রবেশ করে এবং আমরা সূর্যকে দেখতে পাই। লক্ষ্য কর যে দিক বরাবর আলোকরশ্মি আমাদের চোখে লাগে সেটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের আগের যে দিক তার থেকে অনেকটাই আলাদা। তোমরা জানো কোনো বস্তু থেকে যে দিক দিয়ে আলোকরশ্মি আমাদের চোখে আসে সেই দিকেই আমরা বস্তুটিকে দেখতে পাই। সূর্যরশ্মির দিক্ পরিবর্তনের ফলে আমরা সূর্যকে তার প্রকৃত অবস্থানের থেকে আরও উঁচুতে দেখতে পাই। (সূর্য্যের দিকে চেয়ে সেটি কোথায় দেখা যাচ্ছে তাই মাত্র জানা যায়, প্রকৃতই কোথায় আছে তা নয়।) তার মানে আমরা যখন দেখি সূর্য পূর্বদিকে উদয় হয়েছে তখন আসলে সেটি দিগন্তের নিচে থাকে। তেমনি যখন তাকে আমরা পশ্চিমে

অস্ত যেতে দেখি তখন আসলে সেটী দিগন্তরেখার নিচে নেমে গেছে।

আমরা জানি বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার সময় সূর্য্যরশ্মির পথ ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে। এই পরিবর্তন অবশ্য আপতন কোণের ওপর নির্ভর করে। মাথার ওপর দিয়ে আসা রশ্মি সাধারণত বায়ুমণ্ডলে লম্বভাবে আপতিত হয়, তাই বেঁকে যায় না। উদীয়মান বা অস্তগামী সূর্য থেকে যে রশ্মি আসে তা বায়ুমণ্ডলে সবচেয়ে বড় আপতন কোণ তৈরি করে। তাই রশ্মিগুলি সবচাইতে বেঁকে যায়।

চিত্র ১৩। উদীয়মান সূর্যকে দেখায় অধিবৃত্তাকার। (একে এর বাস্তব অবস্থান থেকে বিচ্যুতও দেখায়।)

সূর্যের গোল চাকতির প্রতিটি বিন্দু থেকে আমাদের কাছে আলো আসে। সৌর চাকতির সবচেয়ে ওপরের এবং নিচের দুটি প্রান্তিক বিন্দুর কথা ধর। সূর্য যখন দিগন্তের কাছে, চাকতিটির আপাত ব্যাস অনুসারে সবচেয়ে নিচের বিন্দুটি ওপরের বিন্দু অপেক্ষা দিগন্তরেখার বেশি কাছে থাকবে। নিচের বিন্দু থেকে আসা রশ্মি ওপরের বিন্দু থেকে আসা রশ্মি থেকে বেশি বেঁকে যাবে। ফলে দুটি বিন্দুই ওপরের দিকে সরে যাবে। তাই পুরো সৌর চাকতিটিকে আমরা আকাশে একটু উঁচুতে দেখতে পাব। আবার ওপরের বিন্দুর তুলনায় নিচের বিন্দুটি বেশি সরে যাবে সেই কারণে ওপরে নিচে চেপে গিয়ে চাকতিটি উপবৃত্তাকার দেখাবে। খাড়াখাড়িভাবে উপবৃত্তাকার চাকতি একটু চাপা দেখায়। অর্থাৎ উপবৃত্তের প্রধান অক্ষকে দিগন্তরেখার সমান্তরাল দেখায়। সূর্য আকাশে যত ওপরে ওঠে এই প্রতিক্রিয়া তত কমে যেতে থাকে এবং চাকতিটি বৃত্তাকার দেখাতে থাকে।

২৫। ধূমকেতু কি?

আকাশে সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, নক্ষত্র দেখতে পাওয়া কিছু নতুন নয়। প্রায় প্রতিদিনই আমরা এদের দেখতে পাই। কৃচিৎ কখনও আকাশে আমরা একটি অদ্ভুত চেহারার জিনিস দেখতে পাই। দেখতে যেন একটা লম্বা পুচ্ছওয়ালা উজ্জ্বল বল-এর মত। এই বিশিষ্ট অথচ বিরলদর্শন বস্তুটি ধূমকেতু।

তোমরা জানো আমাদের সৌর জগতে সূর্যকে ঘিরে কয়েকটি গ্রহ পরিক্রমণ করছে। এই গ্রহগুলি উপবৃত্তাকার পথে ঘোরে। সৌর ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে সূর্য একটি বিশাল নক্ষত্র। আমাদের জ্যোতিষ্কমণ্ডল যাকে আমরা ছায়াপথ বলি তার অনেক নক্ষত্রের একটি হলো সূর্য। তোমরা হয়তো জানো না আমাদের এই সৌর জগতে অনেকগুলি ধূমকেতু আছে। তাহলে চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহের মত তারা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না কেন?

কিছু কিছু ধূমকেতুর পথ উপবৃত্তকার। এই উপবৃত্তগুলি বিরাট এবং বেশ সম্প্রসারিত। অর্থাৎ তাদের একটি প্রধান বাহু খুব লম্বা এবং অন্য (অপ্রধান) বাহুটি অপেক্ষাকৃত ছোটো। কোনো কোনো ধূমকেতু আবার অধিবৃত্তপথে ঘোরে। তোমরা জানো অধিবৃত্তের একটি দিক খোলা থাকে যা উপবৃত্তে থাকে না। তাই একটি ধূমকেতু
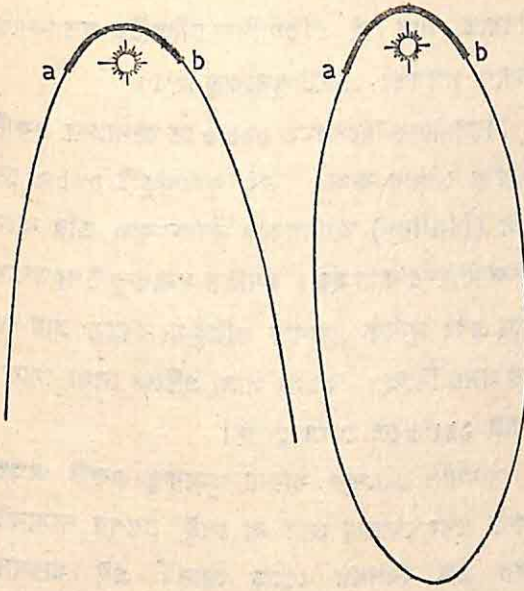
চিত্র ১৪। ধূমকেতুর পথ উপবৃত্ত বা অধিবৃত্তকার। ধূমকেতু যে অংশে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় —ab— উভয় পথেই একই রকম দেখায়।

অধিবৃত্তপথে ঘোরার সময় তার আয়ুষ্কালে একবারই মাত্র সূর্যের কাছাকাছি আসে সেই কারণে এরকম ধূমকেতুকে আমরা একবারই দেখি আর দ্বিতীয়বার দেখতে পাই না। একবারই মাত্র সে দেখা দেয়। সূর্যের চারপাশে ঘুরে এটি শূন্যে মিলিয়ে যায় চিরতরে। অন্যদিকে যে ধূমকেতুগুলি উপবৃত্তপথে ঘোরে তাদের আবারও দেখতে পাওয়া যায়। উপবৃত্তগুলি আকারে রীতিমত বৃহৎ বলে নিজেদের কক্ষপথে একবার ঘুরে আসতে এদের অনেক বেশি সময় লাগে। তাই অনেক বছর পরে পরে তারা আমাদের দেখা দেয়।

ধূমকেতু সূর্য বা নক্ষত্রের মত নয়। এদের থেকে আলো বিকীরণ ঘটে না। চাঁদ বা অন্যান্য গ্রহের মত এরা বরং মৃত বস্তু। একমাত্র সূর্যের আলোতেই এদের দেখা যায়। সূর্যের থেকে দূরে চলে গেলে এরা ক্রমশঃ আবছা হতে হতে আমাদের দৃষ্টি থেকে বাইরে চলে যায়। মনে রেখো প্রতিটি ধূমকেতুই তার নিজস্ব কক্ষপথে ঘোরার সময় সূর্যের কাছাকাছি আসে, সূর্যকে পরিক্রমা করে এবং তারপর দূরে সরে যায়। ধূমকেতু একবার দেখা গেলে একটানা কয়েকদিন ধরে সেটি দেখতে পাওয়া যায়। আমরা সূর্যোদয়ের কয়েক ঘন্টা আগে বা সূর্যাস্তের কয়েক ঘন্টা পরে ধূমকেতু দেখতে পাই তা মনে রেখো। এমনকি কোনোটিকে হয়তো দিনের বেলাও দেখা যেতে পারে। কিন্তু মাঝরাতে যেন ধূমকেতু দেখার জন্যে চেষ্টা কোরো না।

ধূমকেতুর ব্যাপারে একটা সমস্যা আছে। তোমরা দেখেছো কোনো কোনো ধূমকেতু অধিবৃত্ত পথে কোনোটি বা উপবৃত্তপথে ঘোরে। যাই হোক্ না কেন আমরা শুধু ধূমকেতুর সেই পথটুকুই দেখতে পাই যে অংশটি সূর্যের কাছে থাকে। (যে অংশ আমরা দেখতে পাই সেটি চিত্রে ab দিয়ে চিহ্নিত আছে।) দুটি ক্ষেত্রেই পথের অংশটি একই রকম দেখতে। এইজন্যে ধূমকেতুটি উপবৃত্ত পথে না অধিবৃত্ত পথে ঘুরছে তা বোঝা দুরূহ। যদি কোনো উপায়ে বাস্তবিক জানতে পারি যে সেটি উপবৃত্তপথে ঘুরছে তবে আমরা এও সঠিক বলে দিতে পারি যে কতদিন পরে সেটি আবার দেখতে পাওয়া যাবে।

সত্যি বলতে ধূমকেতুর মোটেই কোনো পুচ্ছ নেই। প্রতিটি ধূমকেতুই বহুকণিকার সমষ্টিতে তৈরি একটি বিরাট বলের মত। এই বলটি বরফকণা এবং জমে যাওয়া মিথেন, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি কণা দিয়ে তৈরি। এই গুচ্ছটি চলতে চলতে সূর্যের কাছাকাছি এলে সৌর বিচ্ছুরণের ফলে একটি দীর্ঘ পুচ্ছ ধারণ করে। তোমরা জানো সূর্য প্রচণ্ড পরিমাণ শক্তি এবং বৈদ্যুতিক আধানযুক্ত কণিকা বিকীর্ণ করে। সৌরবিচ্ছুরণ এই গুচ্ছটিকে ঠেলে বিপরীত দিকে সরিয়ে দিলে একটি কণিকা প্রবাহের সৃষ্টি হয়। এই প্রবাহকেই আমরা

ধূমকেতুর পুচ্ছ বলি। স্বাভাবিকভাবেই এই পুচ্ছটিকে সূর্যের বিপরীতদিকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসতে দেখি আমরা। পুচ্ছের মধ্যে কণিকাগুলি খুব পাতলাভাবে ছড়িয়ে থাকে। এজন্যে পুচ্ছটিকে স্বচ্ছ দেখায় এবং আমরা সহজেই এর মধ্যে দিয়ে দেখতে পাই। পুচ্ছটি অনেকখানি দীর্ঘ হয়। কোনো ধূমকেতুর পুচ্ছ ৪ থেকে ৫ কোটি কিমি বা তার থেকেও বেশি দৈর্ঘ্য ধরে শূন্যে ছড়িয়ে থাকে। সত্যি এক বিরাট ব্যাপার !

বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক স্যার আইজাক নিউটন ১৬৮০ সালে একটি ধূমকেতু দেখেছিলেন। কেউ অবশ্য জানে না তার পথ অধিবৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার ছিল। যদি আমরা ধরে নিই সেটি উপবৃত্তপথে ঘুরছিল তবে হিসেবমত সেটি আবার ২২৫৫ সালে দেখা যাবে। তার মানে একবার ঘুরে আসতে এই ধূমকেতুর ৫৭৫ বছর লাগবে। যদি ১৬৮০ থেকে ৫৭৫ করে বাদ দিয়ে পেছোতে থাকি তাহলে একসময় আমরা ৪৫ খ্রীঃ পূঃ সনে পৌঁছে যাব। জুলিয়াস সিজার ৪৪ খ্রীঃ পূঃ সনে নিহত হয়েছিলেন। তাহলে বলা যেতে পারে এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির হত্যাকালে আকাশে সম্ভবতঃ একটি ধূমকেতু ছিল।

বিজ্ঞানীদের হিসেবমত ১৯৮৬ তে আমাদের একটি ধূমকেতু দেখার কথা। এই ধূমকেতুটি ১৬৮২ তে হ্যালি (Halley) আবিষ্কার করেন বলে তাঁর নামে এটিকে চিহ্নিত করা হয়। হ্যালির ধূমকেতু উপবৃত্তপথে ঘুরছে এবং সূর্যকে একবার পরিক্রমা করতে প্রায় ৭৬ বছর সময় নিচ্ছে। ১৯১০ সালে এটিকে দেখা গেছে। আবার ১৯৮৬ তে দেখা গেছে।

সাধারণ লোকের ধারণা ধূমকেতু একটি অশুভ সঙ্কেত এবং কোনো দেশ বা সেই দেশের শাসকের ওপর এটি বিপর্যয় ডেকে আনে। এই ধারণার কোনোই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। যতবারই আকাশে ধূমকেতু দেখা গেছে ততবারই যে কোনো বিপর্যয় ঘটেছে তা নয়। তাছাড়া যখন ধূমকেতু থাকে না তখনও প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি বিপর্যয় ঘটে। যদি ক্বচিৎ কখনও ধূমকেতুর আবির্ভাব এবং বিপর্যয় একসঙ্গে ঘটে সেটি নিতান্তই সমাপতন ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের চারপাশের জগৎ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার এক অভিনব পথ হল 'বিজ্ঞানে কি ও কেন'। প্রতিদিনের দেখাশোনা জিনিসের ভিত্তিতে তৈরি প্রশ্নের উত্তর আছে এখানে। এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে বিজ্ঞানের সূত্র আমাদের ঘিরে থাকা জিনিসের ওপর ব্যবহারিক নিদর্শনের মাধ্যমে।

এই বইয়ে আলোচিত প্রশ্নগুলি ছোটদের মনের প্রশ্ন, আর উত্তরও দেওয়া হয়েছে তাদেরই জন্য, সচিত্র, সহজ উপায়ে; দিয়েছেন উচ্চমানের কৃতবিদ্য বিজ্ঞানীরা।

Rs 14
SBN 19 562370 3